কোনখানে শুরু

মাঠ থেকে বলছি	৫
কাকতালীয়	১৭
দু শরিকের লড়াই	২৪
গোলাপের যুদ্ধ	৩৩
বলরামের সেই সটটি !	৪২
কথায় কথায়	৪৬
ফুটবলে ভেজাল	৫৬
ফুটবল মাঠে পিকেটিং !	৬৩
সংগঠনের দুই চিত্র	৬৯
দক্ষতার বিকল্প নেই	৭৩
অন্য মেজাজের ফুটবল	৮৩
জলসা জমেনি	৯০
পপলুহার ও তাঁর সঙ্গীরা	৯৮
গুরু বিয়োগ	১০৬
অন্য আসরে	১১৬
ক্রিকেটের নন্দনকাননে	১২১
শেষটুকু শোনা হলো না !	১২৯
জয় তালিকা	১৩৯

॥ লেখকের আরও বই ॥

ব্যাটে বলে ক্রিকেট

আকাশে ক্রিকেট বাণী

ক্রীড়াজগতে দিকপাল বাঙালী

মাঠ থেকে বলছি

বলার শুরু ১৯৫৭ সালের পনেরোই জুলাই। উপলক্ষ কলকাতার সিনিয়ার ফুটবল লীগে মোহনবাগান—রাজস্থানের খেলা। সেই খেলা ঘিরেই আমাদের গলাবাজী। খেলার ধারা বিবরণী দেওয়ার কাজে সেদিনেই আমার হাতেখড়ি।

আমার কাছে লগ্নটি ঐতিহাসিক। কিন্তু তা বলে কলকাতার মাঠ থেকে বাংলায় খেলার ধারা বিবরণী প্রচারের প্রচেষ্টা সেই প্রথম নয়। তারও অনেক আগে সুবিখ্যাত কথক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং প্রখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায় ফুটবলের বাংলা বিবরণ শুনিয়েছেন মাঠে বসে বসেই। তবে আগের ঘটনাগুলি ছিল নিতান্তই বিক্ষিপ্ত। সাতান্ন সালে পনেরোই জুলাইয়ের পর থেকেই আকাশবাণীর পক্ষ থেকে নিয়মিত বাংলা ভাষায় ফুটবলের ধারা বিবরণী প্রচারে উদ্যম দেখানো হয়। আগে কথকতার মাধ্যম ছিল ইংরাজী। সাতান্নতেই বাংলার ওপর নজর পড়ে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা অভিনব। কিন্তু চমকে যাওয়ার মতো কিছু নয়। আগে থেকেই পণ করেছিলাম, ঘাবড়াবো না এবং থামবোও না। থামি নি, ঘাবড়াইও নি। প্রথম দিনের কাজ উৎরে ছিল কি? সকলের জবাব জানি না। জানি একজনের অভিমত। তাঁর মতে, উৎরোতে পারি নি। ভদ্রলোক সেদিন মাঠেই ছিলেন। নিজের কানে কিছু না শুনেই খেলা ভাঙতেই নিজস্ব সার্টিফিকেটটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

নীচের গ্যালারিতে বসে তিনি এতোক্ষণ খেলা দেখছিলেন। তখনকার দিনে আজকের মতো ট্রানজিস্টার সেট কোলে নিয়ে

খেলা দেখার রেওয়াজ ছিল না। ভদ্রলোক শুধু খেলাই দেখেছেন, কানে শোনেন নি কিছুই। তবু খেলার শেষে গ্যালারি বেয়ে নীচে নামছি যখন তখন আমাকে লক্ষ্য করেই মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিলেন,

ঐ যে! অফসাইডকে কি বল্লেন! আপনাদের দৌলতে বল, গোল, সটই বা কি করে বাঙালী বনে গেল? হুঁ! বাংলায় আবার খেলার রিলে!

অপরিচিত ভদ্রলোক। পরণে ধোপদুরস্ত সার্ট প্যাণ্ট। তাঁর সঙ্গে তো আর তর্ক জুড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই কিলটা খেয়ে হজম করা ছাড়া উপায়ই বা কি! তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে গেলেও ইংরাজীয়ানার ঐতিহ্য ধরে রাখার দায়িত্ব যাঁরা হাসি মুখেই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা অবস্থার হেরফেরটা মেনে নিতে পারছেন না।

না পারুন, দুঃখ নেই।

আজ না পারলেও, ভবিষ্যতে পারবেন, যদি আমরা বাংলাকে বাংলার মতো করেই বলতে পারি। ইংরেজীয়ানা তো নকলপনা। ও সাজ সরে গিয়ে মায়ের ভাষা মুখের ভাষায় মিলে যেতে কতোক্ষণ! নাড়ীর সম্পর্ক কি আর কেউ ছিঁড়ে ফেলতে পারে? অমন কতো লোককেই তো দেখলাম। গোঁড়ামী ছেড়ে তারাও সব সহজ হয়েছেন।

কিন্তু যাক্ ও কথা। বলছিলাম মাঠের কথা মাঠ থেকেই।

গড়ের মাঠে ঘুণ ধরা কাঠের পাটাতন মোড়া ঘেরাটোপ। তার মধ্যে সার সার গ্যালারি। গ্যালারির মাথায় এককোণে ছোট্ট চিল্ কুঠরী।

কুঠরীটি রীতিমতো হালকা। শন্ শন্ করে বাতাস বইতে শুরু করলে কুঠরীর সর্বাঙ্গ দোলে। আর আশপাশের দর্শকেরা গোল, গোল শব্দে উর্ধ্ববাহু হন যখন তখন তো কথাই নেই। ভাষ্যকারের বাক্সও নৃত্যের তালে তালে ঘন ঘন আন্দোলিত হয়। যতোই

তালে তালে নাচা তাতোই গেল, গেল ভাবনায় ভাষ্যকারদের বদন শুষ্কপ্রায়!

বাক্সটি স্বল্প পরিসর। তবু তারই মধ্যে মাথা গলাতে হয় জন পাঁচ ছয় মানুষকে। দুজন ভাষ্যকার এবং বেতার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রতিনিধি। সেই সঙ্গে প্যাঁটরার মতো একটি যন্ত্রকে। বাক্সটির সামনের দেওয়ালে আড়াআড়ি ঘুলঘুলি। নামে জানালা। কিন্তু বৃষ্টির ঝাপটা আটকাতে কপাট নেই। খোলা জানালা দিয়ে অবিরল বৃষ্টিধারা এবং সেই সঙ্গে সামনের দর্শকদের মন্তব্যের ঝড় ঝাপটাও ঢুকে পড়ে মাইক্রোফোনের গলায় গিয়ে মেশে। সেই জানালা দিয়েই নজর রাখতে হয় মাঠের কোথায় কি ঘটছে।

কিন্তু নজর রাখা কি সোজা ব্যাপার!

খোলা জানালার সামনেই গ্যালারির বেঞ্চ। উৎসাহী দর্শকেরা দয়া করে সেই বেঞ্চের বসার জায়গায় ঠায়পায় দাঁড়িয়ে উঠলেন তো ভাষ্যকারের দৃষ্টি ঢাকা পড়ে গেল। মানুষের শরীর তো স্বচ্ছ কাঁচ নয় যে দেহ ফুঁড়েই ভাষ্যকারের সন্ধানী দৃষ্টি অন্যত্র চলে যাবে!

অতএব ওঁরা বেঞ্চে স্ট্যাণ্ড আপ হলেই ভাষ্যকারের মুখ শুকিয়ে যায়। হাতজোড় করে মিনতি রাখেন নেমে দাঁড়াতে। কেউ শোনেন। কেউ শুনতে চান না। কি করেই বা শুনবেন? তাঁদের সামনেও যে অনেকে দাঁড়িয়ে। সবাই খেলা দেখতে এসেছেন। ভাষ্যকারের অসুবিধে ঘটলো কিনা তা দেখায় তাঁদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু মাথা যাঁর তাঁর অবস্থাটা একবার ভাবুন। দেখতে না পেলেও তাঁকে কথা বলে যেতে হবে। আর কথায় কথায় যদি পান্ থেকে চুণ্ খসলো অমনি দেঁতো হাসি হেসে সামনের আসন থেকেই কেউ বলে উঠলেন, কি দাদা স্রেফ্ গুল্ ঝেড়েই চলেছেন!

দেখতে না পেলেও বানিয়ে বলারও উপায় নেই। ধরা

পড়ার ভয়। ভাষ্যকার যা বলছেন তার প্রতিটি শব্দই সামনের দর্শকদের কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে বাক্সের ব্যবধান ইঞ্চি চারেকও নয়। চোখে দেখবেন এবং কানে শুনবেন বলেই তো তাঁরা বেতার বাক্সের জানালা ঘেঁষে দাঁড়ান। রথ দেখা এবং কলা বেচা, দুইই চলে এক সঙ্গে।

কিন্তু শুধু ভুল ধরার জন্যেই যদি তাঁরা হাজির থাকেন তাহলেই বা আপত্তি করবো কেন? বেশ তো, থাকুন না। থাকলে ভাষ্যকারের হুঁশও বাড়ে। ভুলচুক কমে। কিন্তু ওঁদেরি কেউ কেউ যখন তারস্বরে নিজের মতটি ভাষ্যকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তখনই সত্যিকারের বিপদ বাড়ে। আর সে বিপদ যে কতো মারাত্মক তা ভাষ্যকারেরা ছাড়া আর কেই বা বুঝবেন!

দলবাঁধা দর্শক বিশেষ বিশেষ দলকে সমর্থন জানাতে মাঠে আসেন। তাঁদের দেখার ধরণই আলাদা। নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টির সঙ্গে তা মেলে না। তাই তাঁদের মনের মতো কথাটা যদি ভাষ্যকার উচ্চারণ করতে না পারলেন অমনি আবেদন, অনুরোধ। এবং সময় সময় চোখরাঙানী, কি মশাই বলছেন না কেন! মশায়টির চোখে যে হলদে কাঁচের চশমা নেই তা ওঁরা বুঝতে যাবেন কেন?

কাণ্ড কারখানা দেখে মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে দাঁড়ায়। আবার মাঝে মাঝে মনেও হয়, ঢের হয়েছে, আর কমেন্টেটার সাজার দরকার নেই। ভাষ্যকার সাজাই তো এক ধরণের সাজা! মজা নয়।

মজা টের পেয়েছিলাম একদিন।

সেদিন কলকাতার ঘরোয়া লীগে এক ডাকসাইটে দলের সঙ্গে এক রেলের খেলা। নামী দলটি লীগ পাবার পথে। হঠাৎ পথ জুড়ে দাঁড়ালো রেলওয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথমার্ধের মেয়াদ ফুরোবার আগেই গোলও করে বসলো।

আচমকা কাণ্ড। অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

প্রথম কিছুক্ষণ গ্যালারি মুষড়ে রইলো। তারপরই আরম্ভ হলো কথা চালাচালি। মিনিট কয়েক পর হঠাৎ সামনের এক দর্শক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, কানা রেফারী দেখেও দেখলো না? রেল অফসাইডে গোল করলো যে!

যেমন রা কাড়া, অমনি জুটে গেল সমর্থক। তাঁরাও হাঁকলেন, অফ্‌সাইড, অফ্‌সাইড! কিন্তু তাঁদের হাঁকাহাকি রেফারীর কানে পৌঁছবে কি করে? তিনি তো অনেক দূরের মানুষ।

হঠাৎ যে ভদ্রলোক প্রথম অফ্‌সাইডের ধুয়ো তুলেছিলেন তিনি বেতার বাক্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে হুংকার তুল্লেন, বলুন না মশাই, রেল অফ্‌সাইড থেকে গোল করেছে।

ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। বলুন অফ্‌সাইড, বলুন।

বেচারী ভাষ্যকার। ডাহা মিথ্যেটা বলেন কি করে! কি যে করবেন তিনি তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। এমন সময় আরও শাসানি, আপনারা সবাই শুনুন, উনি কিছুতেই অফ্‌সাইড বলছেন না। আচ্ছা, খেলা ভাঙ্গুক।

কি সর্বনাশ! শুনে ভাষ্যকারের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম আর কি! খেলা ভাঙলে তাঁর মাথাও যে আস্তো থাকবে না! কোন্‌দিক সামলান? ওদিকে খেলা, আর এদিকে রক্তরঙা ধমকের মেজাজ। পালিয়ে যে যাবেন তারও উপায় নেই। বলির পাঁঠার মতো অবস্থা। খেলা শেষ হলেই হাঁড়িকাঠটি তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হবে।

হঠাৎ মুক্তি!

নামী দলটি গোল শোধ দিলো। এবং মিনিট কয়েক পর আরও একটি গোল করে রেলের বাধাকে গেল ডিঙ্গিয়ে। দেখতে দেখতে গ্যালারির মেজাজও গেল বদলে।

অফ্সাইডের হুংকার তুলে যে ভদ্রলোক প্রথমেই আস্তিন গুটিয়েছিলেন তিনি এবার বেতার বাক্সের খোলা জানালার দেওয়াল ধরে আহ্লাদে ঝুলতে লাগলেন। ভাষ্যকারের আগের দোষ দরাজ মেজাজে মাপ করে দিয়ে নিজেই বলে উঠলেন, দাদা জমিয়ে বলুন। ভাষা দিন, যতো রকম পারেন।

একটু আগে যাকে গাধা বলে ডাকতেও তাঁর আটকায় নি, তাঁকেই এবার গদগদ কণ্ঠে দাদা সম্বোধনে আপ্যায়িত করার কি প্রচণ্ড ধূম! একই মানুষ, প্রহরে প্রহরে কি আশ্চর্য্য রূপান্তর! বেতার কথক সে যাত্রায় খুব বেঁচে গেলেন। কিন্তু নামী দলটি যদি জিততে না পারতো তা হলে তাঁর ভাগ্যে কি যে ঘটতো তা ভাববার কথা।

কলকাতার ফুটবল মাঠে দলে দলে, এক কথায় দু দলের সমর্থক মহলে নিজেদের কোলে ঝোল টানার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা তার টানে ভাষ্যকারদের প্রাণ যাবার মতো অবস্থা। ভাষ্যকারের কাজ চোখের সমনে যা ঘটছে তারই বাস্তবানুগ রিপোর্টটিকে বাঙ্ময় রূপ দেওয়া। কোনো দলের প্রতি দুর্বলতা দেখাতে তাঁরা মাইকের সামনে বসেন না।

অথচ মজা এই যে, দল সমর্থকদের কেউ কেউ চান যে তাঁরা বিশেষ বিশেষ দলের প্রতি অন্তরের টান দেখান এবং যে দলকে তাঁরা পছন্দ করেন না কথকও যেন তার চলনকে সব সময়ে বাঁকা বলেই মনে করেন।

যাঁর যে কাজ নয়, তাঁকে সেই কাজ করতে বলা। এবং, হুকুম চালানো। একের কাজ এবং অন্যপক্ষের হুকুম, দুটি তো তেল আর জল। মিশ খায় না। দু পক্ষের চিন্তাই আলাদা। চিন্তায় ও কর্মে সমঝোতা হয় না। গরমিল বাড়ে। কিন্তু যেহেতু সমর্থকদের অনুপাতে ভাষ্যকারেরা সংখ্যালঘু, তাই তাঁদের কথা শুনতে হয়। সইতে হয় চোখ রাঙানীও।

কথার জের মাঠেই ফুরোয় না। বাড়ীতেও চলে। বাড়ীতে চিঠির বাক্স খুল্লেই হাতে আসে আঠায় আঁটা লেফাপাটি। ভেতরে পত্র। লিখছেন ঝাড়গ্রামের সারদাকুঠি থেকে সর্বশ্রী উমা, রুমা ছায়া ও বাবু গুপ্ত (১৯৬৬ সালের এগারোই জুলাই)

'আপনাকে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আপনি অন্তরে যে দলকেই সমর্থন করুন না কেন, সেখানে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের আপত্তি তখনই যখন আপনি কমেণ্ট করতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করেন।'

'মোহনবাগানের পক্ষে সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক গোল করলেন খেলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। এটা সত্যিই আনন্দের কথা। অনেকে আনন্দিত হয়েছিলেন। যদিও আমরা আনন্দিত হতে পারি নি, কারণ আমরা চাই না যে মোহনবাগান জয়ী হোক্। তবে আপনার আনন্দটা যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তা যাক কারণ গোলের মধ্যে আনন্দ আছে বৈকি। কিন্তু সেই আনন্দ কেন বজায় থাকল না যখন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড় লতিফ পেনাল্টিতে গোলটি পরিশোধ করে দিলেন ?'

'ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচের সময়ও এই ত্রুটি দেখা গেছে। হাবিব গোল দিলেন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। সেটা স্বীকার করলেন অনেক কষ্ট চেপে। আর যখনই অসীম মৌলিক গোলটি পরিশোধ করলেন তখন আনন্দ সহকারে সেটা প্রকাশ করলেন।'

ভাষ্যকারের চিঠির বাক্সে আরও অভিযোগ জমা রয়েছে। অভিযোগ তুলেছেন হুগলীর শ্রীসূর্য মল্লিক,

'গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৬৬) ইস্টার্ণ রেল বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলার ধারা বিবরণী শুনে মনে হলো যে আপনি ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থক। এই দলের বিপক্ষে কিছু বলা যেন আপনার পক্ষে বে-আইনী। বিপরীত পক্ষে, এই দলের যে কতো গুণগান করেছেন

তার ইয়ত্তা নেই। একজন ভাষ্যকারের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কোন দলকে সমর্থন করা শোভা পায় না।'

সত্যিই শোভা পায় না। কিন্তু নিজেদের বিচার বিশ্লেষণে যাঁরা এই 'অশোভন' কাণ্ডটি ধরে ফেলেছেন, তাঁরা কারা? তাঁরা হয় মোহনবাগান, আর না হয় ইস্টবেঙ্গলের পক্ষের উকীল। তাঁরা নিজেরা নিরপেক্ষ কিনা তা যাচাই করছেন না। অথচ কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছেন ভাষ্যকারদের।

ভাষ্যকারদের শ্রোতৃমণ্ডলীর মতামতকে মান্য করতেই হয়। তবু মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে অভিমতটি যাঁদের তাঁদের যদি বিচারকের নিরপেক্ষতা না থাকে, তাহলে কি বিচার বিভ্রাট ঘটা স্বাভাবিক নয়?

ঘটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই সরল কথাটি কে তাঁদের কানে তুলবে? কে বোঝাতে পারবে যে এমন মানুষও আছে যার নিজস্ব দুনিয়ায় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের ঠাঁই নেই? ওই দুটি দলের ভাবনাকে বাদ দিয়েই সেই মানুষ তার নিজের চিন্তা জগতকে গড়ে তুলেছে?

তবে সে চেষ্টাও আমি করছি না। বরং খুশী মনে এই কথা মেনেই আশ্বস্ত থাকতে চাইছি যে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল, দু দলেরই গোঁড়া সমর্থকদের (সর্বশ্রী উমা, রুমা, ছায়া, বাবু গুপ্ত, সূর্য মল্লিক) বিচারে ভাষ্যকার হিসাবে আমি তাঁদের দলভুক্ত নই।

তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে আমি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলকে দেখি না। তাই তাঁদের আমি সন্তুষ্ট করতে পারি নি। একপেশে মন জয়ে আমার ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। তবু সান্ত্বনা এই যে সব সময় ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে না যেতে পারলেও নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে পেরেছি। দল সমর্থকদের দরাজ সার্টিফিকেট পেলে কিন্তু এ সান্ত্বনা পেতাম না।

আর এক ধরণের শ্রোতা আছেন যাঁদের দাবী স্বতন্ত্র। নীচের

চিঠিখানি পড়লেই তাঁদের চাহিদার আন্দাজ পাওয়া যাবে। লিখছেন কলকাতা থেকে শ্রীতপন ভট্টাচার্য,

'আমরা যখন রেডিও সেটটি চালু করি তখন প্রথম হতেই খেলা শুনি। সুতরাং খানিকক্ষণ আগে কি হয়ে গেছে তা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নতুন করে বলার মানে হয় বলে জানি না।'

ওঁর কথা অনুযায়ী, হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, সত্যিই কি সবাই একেবারে প্রথম থেকেই শোনেন? সকলের ভাগ্যে কি সে সুযোগ জোটে? কেউ কি মাঝপথে রেডিও সেটের চাবি ঘোরান না?

শ্রীভট্টচার্যের আরও অভিযোগ,

'আমরা খেলা শোনার সময় ভাষার সদ্ব্যবহার শুনতে চাই না। কেবল কয়েকার্ট সোজা কথায় যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খেলার বিবরণটি বলে গেলেই আমরা বাধিত হই। সুতরাং খেলা চলার সময় অত বাজে কথা শুনতে আমরা চাই না।'

কথকতায় 'ভাষার সদ্ব্যবহার' যাঁর বিচারে 'বাজে কথা' কওয়ার সামিল, তাঁর রুচিবোধ ও চাহিদা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই চাহিদা থেকেই ভাষ্যকারদের অসহায় অবস্থার কথা আরও ভাল করে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এতো গেল শ্রোতৃমণ্ডলীর চাহিদার কথা। এর ওপর বেতার কর্তৃপক্ষেরও কিছু চাহিদা আছে।

ভাষ্যকারদের কাজের দায়িত্ব ও ভূমিকার যাথার্থ বুঝিয়ে দেবার সময় তাঁরা লিখিত নির্দেশে জানান যে দেখতে পাই নি একথা বলা চলবে না। দেখার জন্যেই ভাষ্যকারেরা মাঠে রয়েছেন এবং মনে রাখতে হবে যে তাঁদের চোখ দিয়েই শ্রোতৃমণ্ডলী খেলা দেখছেন।

অতএব ক্যালকাটা-মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান্স মাঠের বেতার বাক্সের ঘুলঘুলির সামনে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দর্শকেরা যদি ভাষ্যাকারদের দৃষ্টি পুরোপুরি আড়াল করে দেন

তাহলেও ভাষ্যকারদের দেখতেই হবে। কিংবা এক বর্ষণমুখর অপরাহ্ণে মেঘে ঢাকা জমাট বাঁধা অন্ধকারে ইডেনে হাইকোর্ট প্রান্তে ফুটবল খেলতে খেলতে জনকয়েক খেলোয়াড় যদি এক জায়গায় জোট বেঁধে হাত পা ছুঁড়তে থাকেন তাহলেও ময়দান প্রান্তে প্রায় একশ গজ দূরে বসে ভাষ্যকারদের প্রতিটি খেলোয়াড়ের আচরণের খুঁটিনাটিকে চিনে নিতেই হবে।

নইলে আর ভাষ্যকার কি! নইলে বেতার কর্তৃপক্ষের চাহিদা মিটবেই বা কি করে? এক কথায়, সাধারণ মানুষ হলেও ভাষ্যকারদের দৈবদৃষ্টি থাকতেই হবে। না থাকলে চাহিদা মেটাতে পারেন নি বলে অনেকেই দুয়ো দেবেন।

চাহিদা সকলেরই আছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর, দল সমর্থকদের এবং বেতার কর্তৃপক্ষেরও। শুধু কোন দাবী দাওয়া থাকতে পারে না বেচারী ভাষ্যকারদের।

তাঁরা যদি বেতার বাক্সের আয়তন বাড়াতে, আভ্যন্তরীণ ভীড় কমাতে বা সামনের দর্শকদের দাঁড়ানো বন্ধে ব্যবস্থা করতে এবং ইডেনে ফুটবল খেলার সময় বাক্সটি মাঠের একধার থেকে সরিয়ে মাঝমাঠে নিয়ে আসার আর্জি রাখেন তাহলে ওই সব তুচ্ছ কথায় কান পাতা কেউই প্রয়োজন বলে মনে করেন না।

সত্যিই ভাষ্যকার হওয়ার অনেক সুখ! এতো সুখ, তা কি ছাই আগে টের পেয়েছিলাম! কতো সুখ তা আরও ভাল করে টের পাইয়ে দেবার জন্যে আরও কতোজন যে নিত্যই মাঠে মাঠেই তৈরী হচ্ছেন!

ওই যাঁরা বেতার বাক্সের খুব কাছাকাছিই জায়গা করে নেন, তারপর কারণে অকারণে শোভন, অশোভন, এমন কি অশালীন মন্তব্যও উচ্চকণ্ঠে ছুঁড়ে দেন বেতার তরঙ্গে। তাঁরাও তো কম তৈরী নন! হয়তো ও প্রান্তের শ্রোতাদের বলাই থাকে যে মাঠ থেকে তাঁরা কোন্ কোন্ চিহ্নিত বাণী শোনাবেন।

নিছক মজা করা, আর ভাষ্যকারের গলা চেপে ধরা ছাড়া তাঁদের লাভের আর কোনো অঙ্ক নেই। কিন্তু নিরর্থক মজার চাপে শ্রোতা আর ভাষ্যকারেরা হকচকিয়ে যান। তাঁদের দুর্ভাগ্যের প্রতি কে সহানুভূতি জানাবে? বলতে পারেন, যাঁরা নিজেরা মজা করতে এসে ভাষ্যকারদের মজাটি টের পাইয়ে দেন তাঁদের আপ্যায়ন থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়?

আরও একটি কথা। বেতার তরঙ্গ মারফৎ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপত্তিকর মন্তব্য পাঠিয়ে যাঁরা মজা লোটেন তাঁরা কি করে ফেলেন তা কি তাঁরা ভেবে দেখেন?

কিন্তু চিন্তার প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। নীচের চিঠিতে শ্রীকল্যাণ কুমার দাস (৮বি বর্ধমান রোড, কলকাতা-২৪) সমকালীন সমাজকে সেই চিন্তাতেই উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। শ্রী দাস লিখেছেন,

'পল্লীগ্রামবাসী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি জানিয়েছেন যে যখন কোন খেলার ধারা বিবরণী প্রচার করা হয়, তখন মাইক্রোফোনের যন্ত্রটি কেন এমনভাবে রাখা হয় যাতে দর্শকদের অশালীন মন্তব্যগুলি ধরা পড়ে এবং ধারা বিবরণীর সঙ্গে প্রচার করা হয়। পৃথিবীর যে কোন দেশের লোক এই ধারা বিবরণী শুনতে পারেন এবং দর্শকদের অশালীনতার দরুণ ভারতবর্ষের মর্যাদাহানি হতে পারে।'

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দের অভিযোগ এইটুকুই। প্রতিকারের দায়িত্ব বেতার কর্তৃপক্ষের। কিন্তু শ্রীকল্যাণ কুমার দাসের উপলব্ধি আরও ব্যাপক। লিখছেন তিনি,

'আসল সমস্যা কিন্তু অন্য। মাইক্রোফোনের মুখে হাত চাপা দিলে নোংরা মন্তব্যগুলি না হয় বেতারে প্রচার হবে না। কিন্তু যে রুচি বিকারের ফলে আজকের ছেলেরা গুরুজনদের সামনে, মেয়েদের শোনার সম্ভাবনা এবং ধারা বিবরণীর সঙ্গে বেতারে

প্রচার হবে জেনেও, মাঠের জনসমুদ্রের মধ্যে বসে অনায়াসে অশালীন কথা উচ্চারণ করেন, তার পরিবর্তন কি করে হবে ?'

'অখ্যাত এক গ্রামের আরও অখ্যাত একটি ছেলে খেলা ভালবাসে, ধারা বিবরণী শুনে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। আমাদের শহুরে সমাজের একটি গ্লানিকর পরিণতির অভিব্যক্তি তার মনকে পীড়া দিয়েছে। দেশের অবমানকর আশঙ্কা তার মনকে নাড়া দিয়েছে। আমার কাছে এইটেই খুব বড় কথা হয়ে দেখা দিয়েছে।'

বড় কথা আমাদের সকলের কাছেই। কারণ, বিক্ষিপ্ত রুচি বিকারের পরিণামে সমকালীন সমাজ ও দেশকে ব্যাপকভাবে বিপন্নবোধ করতে হচ্ছে। তাই পত্র লেখক শ্রী দাসের বড় কথাটিকে আমি আরও বড় করে মাঠের দর্শকদের, চিন্তাশীল সমাজের এবং সামাজিক মানুষের বিবেকের সামনে তুলে ধরলাম।

শুভবুদ্ধি ও কল্যাণবোধে আমরা এখনও আস্থা হারায় নি। তাই আশা, রুচি বিকারের সঙ্গে লড়তে রাজী হলে মানুষের বিবেক শেষ পর্য্যন্ত জিতবেই জিতবে। মাঠের খেলায় হার জিত আছে। আছে জীবনেও। গ্যালারির লড়াইয়ে হারজিত থাকবে না, এ কেমন কথা! এক পক্ষ শুধু জিতেই যাবে, যে পক্ষের আয়ুধে বস্তু বলে কিছুই নেই ?

কাকতালীয়

কি কুক্ষণেই না প্রবাদ-পরিচিত কাকটি উড়ে বসেছিল তালগাছের ডগায়! সঙ্গে সঙ্গে পাকা তালটি মাটিতে পড়ে একেবারে লুটোপুটি!

ব্যাস্, আর যাবে কোথায়!

তাল পড়াতেই পণ্ডিতমহলে কথা পাড়াপাড়ি শুরু হয়ে গেল। বাধলো চুলোচুলি তর্ক। মতের পিঠে মত। কথার পিঠে যতো কথা। এ যদি বলে, পাকা তালের শাখাচ্যুতির সময় আসন্নই হয়েছিল, অমনি ও ফুঁসিয়ে ওঠে, তাই কখনো হয়? তাল বেতালা হয়েছে উড়ন্ত পাখীর ভারে। পাখার ঝাপটাতেই। তাল পড়ে যেন সব কিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিলে।

কবে কাক উড়েছিল, আর কবেই বা তাল পড়েছিল? দিনক্ষণ জানা নেই। শুধু জানা রয়েছে যে কাক-তাল ঘিরে অন্তহীন তর্কের খই আজও চুপসে যায় নি।

এই উড়ন্ত কাক আর পড়ন্ত তাল কি শুধু কথারই কথা? কে জানে! মুক্ত মনে, অসম্পৃক্ত চিত্তে কলকাতার খোলা মাঠে ঘুরতে ঘুরতে কাক-তালের শূন্য অস্তিত্বে আমার কিন্তু সন্দেহ জেগেছে। মেঠো পণ্ডিতমানসে উঁকি দিতে পারলে বোধ হয় সে সন্দেহে অনেকেরই ভাগ থেকে যাবে।

সাতাশ থেকে আঠাশ ইঞ্চি পরিধির বৃত্তাকার একটি বলের আত্মপ্রকাশেই কলকাতার ময়দানে মরশুমী খেলার আবির্ভাব। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলটির আবির্ভাব ঘটে যেন হাটে মাঠে আরও গরম ছড়াতে। বৃত্তটির ওজন কতোই বা হবে? বড়জোর ষোল আউন্স। সামান্য অস্তিত্ব তার, কিন্তু প্রভাবে সাংঘাতিক।

হাওয়া দিয়ে ফোলানো-ফাঁপানো এই বলের নামই ফুটবল। নামেই প্রকাশ, খেলাটা পায়ের। কিন্তু সময় বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে পায়ের বল মাথায় চড়ে বসে। খেলোয়াড়দের পায়ের টোকায় বল যখন যত্রতত্র ছোটে তখন অনেকেরই হাত-পায়ের, মায় মাথার পর্যন্ত ঠিক থাকে না। মন উড়ু উড়ু হয়। প্রাণ করে ওঠে আইঢাই। খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে টানাপোড়েন চলে। আর ওদিকে দর্শক মনে জান-মান বাঁচাতে স্নায়ুযুদ্ধ ক্রমশঃই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এমনিতেই ফুটবল মস্তো উত্তেজনার আকর। দেশেবিদেশে সর্বত্রই ফুটবল মাঠের দর্শকেরা হলেন চঞ্চল, উদ্দীপ্ত, প্রাণবান। তার ওপর আবার কলকাতার দর্শকদের বাড়তি প্রাণের পুঁজি— মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল।

একেই ফুটবলের উত্তেজনা, তার ওপর মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ভাবনা! আত্মীয় স্নেহে আর আবেগে এই ভাবনাও ফুটবলটির মতোই ফুলে-ফেঁপে রয়েছে।

সব দর্শকের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু যে হয় মোহনবাগান আর না হয় ইষ্টবেঙ্গল, ঠিক তা নয়। তবে অনেকেরই। বোধ করি কলকাতার দর্শকদের শতকরা নব্বই ভাগেরই। মোহনবাগান তাঁদের নয়নের নিধি। ইষ্টবেঙ্গল প্রাণের প্রাণ।

ছুটি দলই মাঠে নামার আগেই যথারীতি কোমর কষে তোড়জোড় করেছে। শুধু বাংলাদেশ ছেঁকেই নয়, হিল্লী দিল্লী ঘুরে ঘুরে খেলোয়াড় জোগাড় হয়েছে। নামী খেলোয়াড় সব। দামীও বটে। দাম যে কতো তা কেউ ফাঁস করতে চায় না। কলকাতার ফুটবল অপেশাদারী ক্রীড়া যে! তবে তাঁদের নামের ডাকে গগন বিদীর্ণ হয়ে যায়।

যাকে বলে রীতিমতো বাঘা দল।

কিন্তু এ হেন বাঘা দল ছুটি এবার মরশুমের শুরুতেই হোঁচট

খেয়েছে। পোর্ট কমিশনার আর জর্জ টেলিগ্রাফের পাতা ফাঁদ যেন নোটিশ না দিয়েই ওদের জড়িয়ে ধরেছে।

কোথাকার এক পুঁচকে দল এই পোর্ট কমিশনার! সিঁড়ি বয়ে সবে ওপর তলায় ওঠেছে। আর উঠেই কিনা প্রথম সুযোগেই বাঘা দল মোহনবাগানের ঐতিহ্যে টান দিয়ে বসলো। স্পর্ধা আর কাকে বলে! হলোই বা নামমাত্র এক পয়েণ্ট। তার মূল্যই বা কম কি? লীগে শীর্ষাসন দখলে এই একটি মাত্র পয়েণ্ট যে কতোখানি তা যদি অর্বাচীন পোর্ট কমিশনার বুঝতো! বুঝবে কি করে? সিনিয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের রাজতিলকের ছাপ তো আর কোনদিন পোর্ট কমিশনারের কপালে পড়ে নি!

জর্জ টেলিগ্রাফের অপরাধ আরও মারাত্মক। একটি নয়, পুরো দুটি পয়েণ্টই নিজেরা হাতিয়ে ইষ্টবেঙ্গলকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য দল এই জর্জ টেলিগ্রাফ! নিজে কখনো লীগ পায় না। কিন্তু যারা পায় তাদের যাত্রাভঙ্গ করতে সে ওস্তাদ।

তবে জর্জ টেলিগ্রাফ থাক। আপাততঃ পোর্ট কমিশনারের কথাও উহ্য রেখে ফেরা যাক সেই কথায় যে কথার কথায় আজকের কথা পেড়েছিলাম।

মোহনবাগান ড্র করলো পোর্ট কমিশনারের সঙ্গে, ইষ্টবেঙ্গল হারলো জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে। সমব্যথায় ব্যথিত হলেন হৃদয়বান অনুরাগীরা। অপ্রত্যাশিত ধাক্কা। দুঃখে শোকে প্রথম প্রথম তাঁরা সব নিঝুম হয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ কাক উড়িয়ে তাল পড়ার সূত্র খুঁজে পেয়ে তাঁরা সব সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

তাঁদেরি একজনের অভিযোগ:

পয়েণ্ট যাবে না তো কি? নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ কখনো পরের ভিটেতে আস্তানা গাড়ে? আরে বাবা, বাস্তুভিটে শুধু গৃহই নয়, গৃহলক্ষ্মী যে!

দেখেই বোঝা যায় যে বয়স্ক বক্তা অনেকদিনের পোড়-খাওয়া মানুষ। হার-জিত, লাভ-লোকসান, হাসি-কান্নার দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী। তবুও আজ এক পয়েন্টের শোক ভুলতে পারছেন না।

তাঁর ব্যথা কোথায়? প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ময়দানের এক অঞ্চলে কাটিয়ে মোহনবাগান ক্লাব আপাততঃ বাসা বেঁধেছে অন্যত্র। সুযোগ সুবিধার নিরিখে নতুন সীমানা অনেকেরই মনোমত। কিন্তু এই ভদ্রলোকের রক্ষণশীল মন সে পরিবর্তনে সায় দেয় না। হয়তো দিতো যদি মোহনবাগানের বিজয় রথ ছুটতো অপ্রতিহত গতিতে। কিন্তু বাদ সাধলো পোর্ট কমিশনার। বেঁকে বসলো বয়স্ক ভদ্রলোকের সূত্রসন্ধানী মন। মজা এই যে নামডাকওয়ালা খেলোয়াড়েরা যে গোল করতে পারলেন না, সে নজীর রইলো ওঁর নজর এড়িয়ে।

তুষলেন তিনি স্থানান্তরের দৃষ্টান্তটিকে। কিন্তু তাতে রেহাই মিললো না নবীন প্রতিবাদের ঝামেলা থেকে। কাছেই ছিলেন একপাল তরুণ। শুনিয়ে দিলেন তাঁরা:

বাঃ! বেশ বলছেন তো দাদু! নতুন বাড়ীতে কি কেউ নতুন করে বাসা বাঁধে না? আপনার কথায় তাহলে পুরানো কুঁড়েঘরই ভাল? ছেঁড়া অতীতকে ফেলে কেউ তাহলে কোনোদিন নতুন ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারবে না?

রুখে দাঁড়ালেন বয়স্ক,

ওঃ, আটচল্লিশটা বছর তাহলে ছেঁড়া কাঁথারই সামিল হয়ে গেল! যে কাঁথাতে সোনারচাঁদ গোষ্ঠ পাল, কুমার, রবি গাঙ্গুলী, করুণা ভট্চার্যেরা মানুষ হয়েছিলেন? গৃহলক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলছো বাপ্, ঠ্যালা বুঝবে পরে। হকিতে কি হলো?

ছেলের দল কিন্তু বুঝলেন না। ধমকে উঠলেন সরোষে,

রেখে দিন মশায় আপনার সেকেলে কথা। মনটাকে বড় করুন দিকিনি। এতোটুকু মন নিয়ে মাঠে আসেন বলেই তো
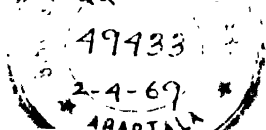
যতোসব অনাছিষ্টি ঘটে। আপনারাই হচ্ছেন মোহনবাগানের ব্যাড্ লাক্। যতো অলুক্ষণে সব!

একেবারে ডিরেক্ট আক্রমণ এবার। কথা বাড়ালে অতঃপর সত্যিকারের বিপদ বাড়তে পারে। কি জানি যা দিনকাল পড়েছে! আর জড়ালেন না ভদ্রলোক। রণে ক্ষান্তি দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ক্রমশঃই মিলিয়ে গেলেন।

মিলিয়ে একেবারে বেমালুম গায়েব। পরের খেলায়, নতুন মাঠের নতুন পরিবেশই মোহনবাগান বাটাকে হারালো পরিষ্কার পাঁচ গোলে। ভেবেছিলাম, আজ হয়তো ভদ্রলোকের হাসিমুখের সন্ধান পাবো। সেই আশাতেই দাঁড়িয়ে আছি গেটের ধারে। কিন্তু হায়! দাঁড়ানোই সার! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে উঠলো, কিন্তু ওঁকে আর ধরা গেল না। কোথায় উনি? হঠাৎ কানে এলো:

'না রে, নেই। ভেগেছে।'

তাকিয়ে দেখি, সেই ছেলের দল। ওরাও 'দাদুর' জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, কিছু সম্ভাষণ, কিছু আপ্যায়ন উপহার দিতে। নতুন ভিটেতে নাকি 'জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা আদায় করা যায় না!' মজা লুটতে চেয়েছিলেন ওঁরা। কিন্তু মজাদার 'দাদুটি' আজ একেবারে নো-পাত্তা!

মজার আশায় আর একদিন অন্য মহলেও কান পেতেছিলাম। সেখানকার আলোচ্য ঠিক তুক্‌তাক্ নয়, কিন্তু আলোচনার সুর সপ্তমে চড়ানো। জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে পুরো দুটো পয়েণ্ট গিয়েছে। মেজাজ চড়বে না তো কি?

কেন যাবে পয়েণ্ট? কেন, কেন? একমুখে একটি প্রশ্নই উচ্চারিত।

খোলা মাঠের এখানে ওখানে গোল হয়ে গুলতানি পাকিয়ে খোলা মনকেই ওঁরা উন্মুক্ত করে দিচ্ছিলেন। সেখানে জনে জনে

সবাই বহুদর্শী। বিজ্ঞ নির্বাচক। নির্বাচনের দায়িত্ব যদি তাঁদের হাতে থাকতো তাহলে প্রতি খেলায় জয়লাভের পথটা সহজেই তাঁরা যে বাৎলে দিতে পারতেন সে কথাটাই তাঁরা ঘোষণা করছেন।

সেখানে হাঁকাহাঁকি চলছে ঃ

সব বাদ দাও। রামবাহাদুর ছাড়া সবাইকে। বাতিল করার মালিক তো উনিই!

না, না, মৌলিক থাক্। গোল করবে কে? দেখলে না, প্রথম খেলাতেই হ্যাট্-ট্রিক?

আরে রেখে দাও তোমার মৌলিক। খেলাতো এরিয়ান্সের সঙ্গে। তার আবার হ্যাট্-ট্রিক! ধোপে টেঁকে কিনা সন্দেহ।

টিম সিলেক্ট করেছে! ওরা বোঝে কি? বলে পা দিয়েছে কখনো? সন্দেহ নেই, তিনি দিয়েছেন নিশ্চয়ই!

তখনই বলেছিলাম, বলরাম-অরুণকে ছেড়ো না। এখন হোলো তো? যেন বক্তা মনে করলেই ওঁদের দলে ধরে রাখতে পারতেন!

আরও অনেক কথা আফশোস, ক্ষোভ, আবেগের সুরে। হবারই কথা। দু'দুটি পয়েণ্টের দাম তো সামান্য নয়।

পরের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল জিতলো তিন গোলের ব্যবধানে। সেদিন কিন্তু নির্বাচনের ফাঁক, খেলোয়াড়দের ত্রুটিবিচ্যুতি কিছুই নজরে এলো না। সমালোচনার সুর, প্রতিবাদের কণ্ঠ, কৈফিয়তের দাবী, সবকিছুই নির্বাক। শুধু সোহাগিনী ময়দান হেসে উঠলো, খুশীতে ডগমগ, কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চকিত হয়ে। সেদিন কোনো কাক ওড়ে নি, ডালছেড়ে তালও মাটিতে নামে নি। নির্বাচকমণ্ডলীর সব কাজের মানে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। ভাল লাগার আমেজ ভরিয়ে তুলেছিল চারপাশকে।

ওঁরা, ওই যাঁরা কখনো হাসছেন, কখনো দুষছেন, তাঁরাই হলেন কলকাতার ফুটবলের বেগবান প্রাণ। কলকাতার ফুটবলকে এক বিচিত্র চরিত্রে সাজিয়েছেন ওঁরাই। হয়তো সে চরিত্র বোধহীন।

তবু তা চিনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট আমুদে। আমরা ওঁদের নিয়ে হাসাহাসি করছি বটে, কিন্তু ওঁদের উৎসাহে ঘাটতি পড়লে স্ফূর্তিমাখা কলকাতার ফুটবলের চেহারা কি আধখানা হয়ে যেতো না?

আর থিতানো উৎসাহে, বয়সের চাপে আজ যাঁরা সংযত, মিত আচরণ, তাঁরাও কি কোনোদিনই বেহিসেবী, ঢিলেঢালা মেজাজে ময়দানী ফুটবলে জড়িয়ে থাকেন নি? আজ না থাকলেও, অতীতে?

ফুটবল-পাগল (কলকাতার মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল পাগল) জনতা তো শুধু 'ক্রাউড'ই নয়, আসলে 'পাসিং ক্রাউড'। কাল থেকে কালান্তরে পা মেলেই 'ক্রাউড' হয়েছে 'পাসিং ক্রাউড'।

এই 'ক্রাউড'ই হলো কলকাতার ফুটবল মাঠের জীবন-যৌবন। সে জীবন অক্ষয় হোক্। শুধু প্রার্থনা—রুদ্ধ আক্রোশে ছুঁড়ে ফেলা বিক্ষিপ্ত ইট-পাথরের টুকরোগুলিকে যেন 'পাসিং ক্রাউড' মাঠ থেকে চিরকালের মতো সরিয়ে নিতে শেখে।

কলকাতার সব ভালো, শুধু বিদ্বেষে জারিয়ে রাখা খণ্ড খণ্ড উপল ছাড়া। শক্ত নীরেট পাথর কেবল মাঠের শান্তিতেই ঘা বসায় না, মাঠের মানুষদের চরিত্রেও মোটা দাগের আঁচড়ও টেনে দেয়। ওগুলো বিদায় নিক্। চরিত্র নিষ্কলুষ হোক্।

কাক থাক, তালও থাক। সেই সঙ্গে থেকে যাক অফুরন্ত মজাও।

দু শরিকের লড়াই

মজার লোভেই মাঠে যাওয়া। গিয়ে দেখি,

আরম্ভে আকাশ ছোঁয়া আশা, মাঝপথে আহা এবং ওহোঃ, অন্তিমে আফশোষ—এই ত্রিধারা অভিব্যক্তির মধ্যেই গেল শনিবারের লীগ ফুটবল খেলার আসল পরিচয় রয়ে গিয়েছে।

খেলা মোহনবাগানে ইস্টবেঙ্গলে। লোকপ্রিয়তার পুঁজি যাদের অপরিমিত। ঘরোয়া আসরে সাফল্যের নিরিখে যারা কীর্তিখ্যাত। সমর্থক, অনুরাগীর সংখ্যা যাদের অগুন্তি। এমন দুটি দলের খেলা যে মস্তো এক অনুষ্ঠান তাতে সন্দেহ কি।

খেলাটি আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই সম্ভাব্য ফলাফল ঘিরে অনেক আলোচনা হয়েছে। ট্রামে-বাসে, পথে-রোয়াকে, দপ্তরে-বৈঠকে কথার ফুলঝুরি। একখানি টিকিটের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কতো লোক যে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তারই বা ঠিকঠিকানা কি! কলকাতায় বড়সড় স্টেডিয়াম নেই। আছে কেঠো পাটাতনে ঘেরা সীমাবদ্ধ গ্যালারীর কাঠামো। তাতে আর কতো লোক আঁটে! ময়দান গড়ের কাছাকাছি উঁচু টিবিটার ছাদে যতো লোক ধরে তার চেয়ে বেশী কি? কাজেই খেলা দেখার সাধ ছিল যতোজনের টিকিট জোগাড়ে সাধ্য ছিল না তার চেয়ে বেশীসংখ্যক উৎসাহীর।

বয়স যাঁদের কম, অথচ উৎসাহ ফেটেপড়ার মতো, তাঁরা আগের দিনে ভোরেই মাঠের দোরগোড়ায় লাইন দিলেন। পুরো দেড়টি দিন গড়ের মাঠে মুক্তাঙ্গনেই কেটে গেল। ভোর থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত ঠায় পায়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা যখন মাঠে ঢুকলেন তখন মেজাজ হাতে চাঁদ পাওয়ার তৃপ্তিতে ভরপুর। কিন্তু আরও পরে আসর

যখন ভাঙলো তখন কি পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা ওঁদের মুখে অমন করে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল ?

বোধহয় পারে নি। অন্ততঃ ওঁদের কথাবার্তায় আমার তাই মনে হয়েছিল। কতো কথা! কথার কি শেষ আছে! যতো কথা ততোই আক্ষেপ। ততোই উষ্মা! এবং এই আক্ষেপ যতো না খেলার মানকে ঘিরে তারচেয়ে বেশী ফলাফলকে কেন্দ্র করে। ওঁরা সবাই হারজিৎ চেয়েছিলেন। মান নিয়ে ওঁদের সকলের মাথাব্যথা নেই। থাকলে হয়তো অমন করে ফুঁসিয়ে উঠতেন না। কারণ, সারাক্ষণ না থাকলেও প্রথম পর্বে এই খেলার একটা সুনির্দিষ্ট মান ছিল। চোখ থাকলে সে মানকে চিনে নেওয়া যায়। মন থাকলে উপভোগও করা যায়।

দূর ছাই! আর খেলা দেখতে আসবো না। এর নাম খেলা! এই খেলা মোহনবাগানের আর ইস্টবেঙ্গলের! ঘরমুখী জনতার একজন সখেদে কথাগুলি বলে চলেছিলেন।

পাশ থেকে জবাব দিলেন বন্ধু, আরে ওদের খেলা এইরকমই হয়। এতো খেলা নয়, স্নায়ুর লড়াই। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা এর চেয়ে ভাল হয়েছে কবে ?

ফিরতি পথের ধারেই ঘাস বিছানো মাঠ। জনকয়েক গা এলিয়ে সেখানেই বসে পড়েছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। উত্তেজনা থিতিয়ে এসেছে। এখন ঢিলেঢালা আলোচনার অবকাশ। সেই আলোচনাই সেখানে চলছে।

যাই বলিস, মোহনবাগান কিন্তু আজ খুব বেঁচে গিয়েছে! দু দু'বার বল বারে লেগে ফিরলো। আমি তো ভয়ে চোখ বুজেই ফেলেছিলাম!

পাশের ভদ্রলোক অতো সহজে মোহনবাগানকে অসহায় মানতে রাজী নন। তাই প্রতিবাদে মুখর হলেন,

বাঁচাবাঁচির আছে কি ? বারে বল লাগা তো আর গোল নয়।

বারও যা, মাঠও তাই। গোল ফাঁকা পেয়ে যারা বারে বল লাগায় তারা আবার জিতবে কি? পারলে তো জিতবে!

টুকরো টুকরো অনেক কথা কানে আসছিল। নিছক অর্থহীন নয়। কথাগুলোর মানে আছে। কথার অর্থ বোঝা গেলে শনিবারের ওই খেলার বাস্তব ছবিটিও চোখের সামনে তুলে ধরা যাবে।

সত্যিই তো, গোলে ঢোকাবার সুযোগ, নির্বিঘ্ন সুযোগ, পেয়েও যাঁরা বলটিকে বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন, ঠেলে দেন পোস্টের পাশ কাটিয়ে দুরান্তে, বলের ধাক্কায় বার কাঁপিয়ে তোলেন অথবা পড়িমরি করতে গিয়ে বলটিকে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ফেলে নিজের পায়ে নিজেই বেড়ি পরান, তাঁরা জিতবেন কি করে? কতো সুযোগ এলো আর আঙুলের ফাঁক গলে পালিয়ে গেল! পাঁকাল মাছের মতো অবস্থা আর কি! অবস্থাটা বড্ড করুণ হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে যেহেতু তাঁদের ফরোয়ার্ডরাই পেয়েছিলেন বেশী সুযোগ। যদিও দিনের সহজতম সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তা নষ্ট করেছিলেন মোহনবাগানের অশোক চ্যাটার্জীই।

ফুটবলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা গোলের। গোলই একদলের ভাগ্য গড়ে। আর এক দলের কপাল ভাঙে। হারজিতের ফয়সালা হয় গোলেই। গোলই দলের লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা থাকে মূলতঃ পুরোভাগের খেলোয়াড়দের ওপর। সেই দায়িত্ব পালনে শনিবারের আসরে দু'পক্ষের দশজন ফরোয়ার্ড প্রত্যাশিত পথ পরিক্রমণে সফল হয়েছিলেন কি?

সত্তর মিনিটে মাত্র দুটি গোল। আর অনেকগুলি সুযোগ নষ্টের নজীরে দর্শকদৃষ্টি ভারাক্রান্ত। আরও বড় কথা, গোল করার সন্ধানে ফেরার সময় অনেকে যেন অক্ষমতার ও অনিশ্চয়তার গোলক ধাঁধায় মিছিমিছি ঘুরেছেন। মনের পুঁজিতে যখন টান পড়ে, শরীর যখন আর বইতে পারে না, তখন এমন হয়রানি এড়ানো সহজ নয়।

চুনী গোস্বামী, পরিমল দে, অসীম মৌলিক, সমাজপতি, অশোক

চ্যাটার্জীর নামডাক কম নয়। সে নাম তাঁরা ফাঁকির পথে অর্জন করেন নি নিশ্চয়ই। ভাল খেলে অনেক আসর মাৎ করে উচিত মূল্যেই তাঁরা সে নাম কিনেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, শনিবারের বারবেলায় তাঁদের কেউই নিজের নামের ছিটেফোঁটাটুকু পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেন নি। ওঁদের দেখে চেনাজানা আগেকার ছায়াগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। খেলার মান ওঁদের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু সেই মানকে উঁচুতে টেনে তুলে নিতে ওঁদের কেউই হাত বাড়াতে পারেন নি।

দু' দলের পুরোভাগের খেলায খাদ মিশেছিল অনেকখানি। খাদের বদলে বস্তু আমদানী করতে সবচেয়ে সনিষ্ঠ ছিলেন গুরকৃপাল সিং। গুরকৃপাল মেহনতী মানুষ। চুনী পরিমল কান্নান হাবিবের মতো বুদ্ধিধর নন। কিন্তু বুদ্ধিব ঘাটতি তিনি পুষিয়ে দিয়েছিলেন পরিশ্রমে। ব্যক্তিগত কর্মের জোয়ারেই গুরকৃপাল সেদিন প্রথমার্ধে বিপক্ষের রক্ষণব্যূহকে প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! নড়েচড়ে দৌড়ে সরে এবং একটি সটের মতো সট করে বিপক্ষের রক্ষণব্যবস্থাকে তচনচ করার জন্যেই যেন তিনি কোমর বেঁধেছিলেন! কি সটই না করেছিলেন! আচমকা কিক্। যেমন জোরালো তেমনি স্থির। বিনা নোটিশে তিনি যে মারণাস্ত্র শানাচ্ছেন সে কথা মোহনবাগানের একজন খেলোয়াড়ও, মায় গোলরক্ষকও বুঝতে পারেন নি। ট্রিগার টানা গুলীর মতো বলটি পায়ের ধাক্কায় চোখের পলকে বারে গিয়ে আছড়ে পড়লো। ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক ফিরলেই নির্ঘাৎ গোল।

দেখবার মতো একটি সট চুনীও মেরেছিলেন। কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের বিচারে এবং আকস্মিকতার চমকে গুরকৃপালের সট অনেক উঁচু জাতের। চুনী বিপক্ষকে দেখিয়ে, জানিয়ে ভলি মেরেছিলেন তাই থঙ্গরাজকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারেন নি। গুরকৃপাল সট করার সময় কাউকে কিছু বুঝতে দেন নি। কাজেই তাঁর সটের কাছে হার মেনেছিলেন সবাই।

ছু' পক্ষের আর আর ফরোয়ার্ডদের মধ্যে কান্নান খেটেছেন, হাবিব বিক্ষিপ্তভাবে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অরুময়ের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল তা প্রথমার্ধে মালুম পাওয়া যায়। কিন্তু বিরতির পর তাঁকে কাজেই লাগানো হয় নি। উইং ফরোয়ার্ড বল না পেলে খেলেন কি করে!

অরুময়কে কাজে লাগাতে বোধহয় আগেভাগে কোনো পরিকল্পনাই স্থির করা হয় নি। ছু' দলের ক্রীড়ারীতির সামগ্রিক বিন্যাসেও পূর্ব পরিকল্পনার দৈন্য ছিল।

আজকাল কোচিংয়ের যুগ। মাঠে নেমে কোন দল কোন নির্দিষ্ট ছক মেনে খেলবে কোচ তা আগেই বলে দেন। কিন্তু অগোছালো মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকে এবার দিনের পর দিন মাঠে দেখে আমার মনে হয়েছে যে তাঁদের ক্রীড়ারীতি পরিচালনা করায় উপযুক্ত কোচের মস্তিষ্ক এবং পূর্বপরিকল্পনা আদৌ সক্রিয় নয়। ছক না মেনে এলোমেলোভাবে খেলেও অগোছালো ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যে জিতছে তার মূল কারণ ছুটি। প্রথম কারণ, লীগে তাদের বেশীর ভাগ প্রতিদ্বন্দ্বীই হলো ছুর্বল ও অশক্ত, ওঠানামা প্রথাবর্জিত ব্যবস্থায় যাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছু' দলেই এমন ক'জন ফরোয়ার্ড আছেন যাঁরা একালের নিরিখে সাধারণ খেলোয়াড়দের চেয়ে যোগ্যতর। তাঁরাই জিতিয়ে দিচ্ছেন। ছু' দলেরই ক্রীড়ারীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি বিশেষের সামর্থ্যে যেদিন টান পড়ে সেদিন আর বিজয়তোরণের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় না। ছক মেনে খেললে, দলগত সংহতিতে পৌঁছানো সম্ভবপর হলে, প্রকরণগত নৈপুণ্য অধিগত থাকলে ছু' দলকে অসহায়ের মতো ছু' একজন ফরোয়ার্ডের (চুনী গোস্বামী, পরিমল দে) ব্যক্তিগত ভূমিকার পায়ে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকতে হোতো না। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা লক্ষণ হিসেবে ভাল নয়।

উপযুক্ত কোচদের বা সুচিন্তিত পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছু' দলের

খেলা যদি পরিচালিত হোতো তাহলে শনিবারের আসরে মাঝমাঠের অনেকখানি জায়গা অমন অরক্ষিত পড়ে থাকতো না। মাঝমাঠে বেওয়ারিশ ভূখণ্ড দেখে মনে হয়েছে যে দু' দলে হাফব্যাক বলতে বুঝি একজনও নেই। থাকলেও ছক না থাকায় না থাকারই সামিল। তাই ঝড়-ঝাপটার প্রচণ্ড চাপ সইতে হয়েছে জার্নেল সিংকে। জার্নেল এ কাজে খুবই পোক্ত—যদিও শনিবারের চাপ বিক্ষিপ্তভাবে তাঁকেও বিচলিত করেছিল। দেবনাথ, নঈম ও শান্ত মিত্রকে এমন তুফানের সামনে পড়তে হয় নি। তবে তাঁদের অস্তিত্বও শক্ত ভিতে দাঁড়িয়েছিল। শান্ত শুধু প্রতিরোধই করেন নি। এগিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ডদের পাশে দাঁড়িয়ে তিন ব্যাকে সাজানো ক্রীড়ারীতির সার্থকতা বোঝাতেও চেষ্টা করেছিলেন। হাফব্যাকেরা হলেন দলের মেরুদণ্ড। রক্ষণ ও আক্রমণভাগে সেতু বন্ধন করেন তাঁরাই। তাঁরা যেমন পিছিয়ে পড়ে রক্ষণব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলেন তেমনি দরকার পড়লে এগিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ডেরও কাজ করে আসেন। তাঁদের ভূমিকা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শনিবারে সে গুরুদায়িত্ব পালনে একজনকেও উপযুক্ত বলে মনে হয় নি।

তার ওপর দু' দলের অনুসৃত অগোছালো ক্রীড়াপদ্ধতির চাপ ছিল। সেই চাপ সামলাতে হাফব্যাকদের হিমসিম খেতে হয়েছে। এবং চাপের মুখে হাফব্যাকদের সাহায্যে ফরোয়ার্ডদের পিছিয়ে আনেন নি। হাফব্যাকদের পাশে দাঁড়ানোই তো ছকবাঁধা সুপরিকল্পিত ক্রীড়াপদ্ধতির অঙ্গ। কিন্তু কোথায় পরিকল্পনা এবং কোথায় বা সেই সাহায্যকারীর দল? একেবারে শেষদিকে কান্নান হাফব্যাকদের সাহায্যের সদিচ্ছায় দু' এক কদম পিছিয়েছিলেন বটে। কিন্তু এ কাজে অন্য ফরোয়ার্ডদের ছিল রীতিমতো অনিহা। এক ফরোয়ার্ডকে আধা হাফব্যাক ও আধা ফরোয়ার্ডের নির্দিষ্ট দায়িত্ব না দিয়ে হাফব্যাক চন্দন ব্যানার্জীকে পুরোপুরি চতুর্থ ব্যাক হিসেবে মাঠে দাঁড় করানো, মাথায় ফেট্টি বাঁধা অকেজো রামবাহাদুরকে মাঠে নামানো এবং

আগে পরখ না করেই নিয়মিত স্টপার সি প্রসাদকে অনভ্যস্ত উইং হাফের দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানানো—এসবই হচ্ছে এলোমেলো চিন্তার প্রকাশ এবং গোঁজামিল দিয়ে সমস্যা সমাধানে বিফলপ্রয়াস। প্রস্তুতিপর্বে, এতো ভেজাল মিশলে সকলের খেলা ভাল হয় কি করে ?

যাঁরা বলেছেন যে দু' দলের মনে স্নায়ুর চাপ বড্ড বেশী ছিল বলে খেলাটি তেমন আশানুরূপ মানে পৌঁছতে পারে নি তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। প্রথমার্ধের খেলার মান নিন্দনীয় নয় এবং স্নায়ুসমস্যা যাই থাক না কেন শেষ পর্যন্ত তার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল প্রকরণগত ক্রটি। সেই ক্রটিই খেলোয়াড়দের নাকাল করেছে। স্নায়ুর চাপে খেলোয়াড়দের ভুগতে হয় প্রথম দিকে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কি স্নায়ুর পীড়ন আগের মতোই সক্রিয় থাকে ?,

খেলাটি যে একেবারে নীরেস মানে নেমে পড়েছিল, একথাটিও ঠিক নয়। আশ্বাসজনক মানের প্রতিশ্রুতি ছিল প্রথমপর্বের খেলায়। তখন খেলোয়াড়দের শরীর ও মন দুই তাজা। উদ্যমে স্ফূর্তির লক্ষণ। ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতার এবং প্রকরণগত ক্রটি যা ছিল তা মেরামত করে নিতে তাজা মন ও নতুন উদ্যম তখন সক্রিয়। তাই তখনকার খেলার মেজাজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজে ভরপুর। রসিকজন সেই মুহূর্তে খেলাটিকে অবশ্যই উপভোগ করতে পেরেছেন। কিন্তু বিরতির পর যেই খেলা শুরু হলো অমনি চোখের সামনের ছবিটা গেল বদলে।

বিশ্রামান্তে ইষ্টবেঙ্গলের প্রাধান্যের যুগ। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চরিত্র হারিয়ে খেলা একপেশে অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হলো। প্রথম পর্বের মান উঁচু থেকে নীচে পড়লো গড়িয়ে। তখনকার খেলা আর সমানে সমানে নয়। তখন মোহনবাগান হার এড়াতে ব্যস্ত, ইষ্টবেঙ্গল জিততে। তবু হারজিত হলো না যেহেতু কোণঠাসা

দলের মতোই প্রবলতর পক্ষের আচরণেও তখন প্রকরণগত ত্রুটির অনেক লক্ষণই স্পষ্ট। এই ত্রুটিতেই তাদের ফরোয়ার্ডেরা ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করে তুলতে পারেন নি। দেহের ভারসাম্য রক্ষার, গতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল তখন তাঁদের আর আয়ত্তাধীন নয়।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খেলোয়াড়দের একটি অপরিহার্য গুণ। সর্বাত্মক চেষ্টায় ছোটাছুটি, লাফালাফির টানে দৈহিক সামর্থ্য যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে সেই সক্রিয় চেষ্টাও আত্মঘাতী প্রয়াসের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। শনিবার অপরাহ্ণে ইষ্টবেঙ্গলের দু' একজন ফরোয়ার্ড এবং মোহনবাগানের অশোক চ্যাটার্জিও বোধহয় সময়ের আগেই (এবং আরও ক'জন ছোটাছুটি, লাফালাফি না করে, না খেটেই !) ফুরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই নাগালে গোল পেয়েও তাঁরা গোলের গোলকধাঁধায় ঘুরে অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ওঁদের দিকে তাকালেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত রইলো কেন।

জয়ে পরাজয়ে এই খেলার ফয়সালা হবেই বা কেন ? খেলার হারজিৎ হয় গোলে। গোল করেন খেলোয়াড়েরাই। গোল চাই, ফয়সালা চাই, আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার জুড়লেও গোল হয় না। গোল করতে হয়। খেলোয়াড়েরা গোল না বানাতে পারলে চাওয়া ও পাওয়া সন্ধিতে জড়ায় না। যেমন খেলেছেন খেলোয়াড়েরা তাতে খেলাটি অমীমাংসিত থাকাই মানানসই। প্রাধান্য বজায় রাখা আর গোল করা এক নয়। প্রাধান্যে যে সম্ভাবনা থাকে গোলে তা ফুটিয়ে তুলতে হয়। কোনো দলই সেদিন জেতবার মতো খেলেন নি। প্রাধান্য সত্ত্বেও ইষ্টবেঙ্গল নয়। কাজেই ফলাফলের বন্ধ্যাত্ব মেনে নিতে আমার এতোটুকু আফশোষ নেই। যে খেলায় সুযোগের পর সুযোগ উড়নচণ্ডীর মতো উড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই খেলার নিষ্পত্তি না হওয়াই তো উচিত।

আগেই বলেছি যে প্রথম পঁয়ত্রিশ মিনিটের খেলা আমার ভাল

লেগেছে। শেষের পঁয়ত্রিশ মিনিট নয়। ভাল লাগে নি শেষার্ধের আরও ক'টি নজীর। সে সব বিসদৃশ নজীর। দেবনাথ ও প্রসাদের ফাউল করার এবং প্রশান্ত সিংহ ও জার্নেল সিংয়ের রেফারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির দৃষ্টান্তের কথাই ধরা যাক না। জার্নেল ও প্রশান্ত, দুজনেই সংযত মেজাজের খেলোয়াড় বলে পরিচিত। তাই তাঁদের ব্যবহারে অবাক হয়েছি। বড় রকমের ফাউল করার জন্যে প্রসাদকে মাঠের বাইরে যেতে হয়েছে। দেবনাথ অনুরূপ অপরাধ করেও ধরা পড়েন নি।

এইসব নামকরা খেলোয়াড় কবে বুঝবেন যে খেলার মাঠের শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখায় তাঁদের দায়িত্ব কতোখানি? কলকাতার ময়দান ইদানীংকালে এমনিতেই বারুদের কারখানায় পরিণত হয়ে আছে। নিতান্ত অকারণেই সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটছে। তার ওপর এই বারুদে যদি খেলোয়াড়েরা উত্তেজনার যোগান দেন তাহলে সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলে উঠতে আর কতোক্ষণ! তাই আবেদন, পরিপার্শ্বে নজর রেখে সব দলের খেলোয়াড়ই যেন সংযম অভ্যাস করেন। সংযমে, বিনয়েই খেলোয়াড়ের চরিত্র-মহিমা স্বপ্রকাশ। আস্ফালনে নয়।

তবে খেলোয়াড়দের উস্কানির মুখে দর্শকেরা মনের উত্তেজনার রাশ টেনে ধরে রেখেছিলেন। তাতেই ক্রীড়াঙ্গনের আদর্শ পরিবেশের মর্যাদা বেশীর ভাগ সময়ই অক্ষুণ্ণ ছিল। পাশাপাশি ছিল খেলা পরিচালনায় রেফারীর যোগ্যতা ও দৃঢ়তা। তিনি শক্ত হতে চেয়েছিলেন বলেই অপ্রিয় কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। দু' দলের খেলোয়াড়কেই তিনি বার করে দিয়েছেন। কাজেই দু' দলের সমর্থকদেরই তিনি হয়তো খুশী করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে তিনি যে পরিষ্কার থাকতে পেরেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গোলাপের যুদ্ধ

কলকাতার ফুটবল মাঠে খাঁটি মর্যাদার যা কিছু লড়াই তা ওই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের দ্বন্দ্ব ঘিরে। ওরই ছায়ায় আরও যে একটি অনুষ্ঠান অধুনা সাড়া তুলছে তাকে আমরা বলি 'গোলাপের যুদ্ধ।' গোলাপের যুদ্ধ গ্রেট বৃটেনের জীবনেতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু ইতিহাস থাক। হচ্ছে খেলার মাঠের কথা।

খেলার মাঠেও 'গোলাপের যুদ্ধের' অস্তিত্ব আছে। ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে ইয়র্কশায়ার আর ল্যাঙ্কাশায়ারের লড়াইয়ের সংজ্ঞা 'ব্যাটল অব্ রোজেস'। সেখানে দু পক্ষে রেষারেষি আছে। তবে অশোভন আস্ফালন নেই। মর্যাদার প্রশ্ন জিয়ানো। কিন্তু জান্ মান্ কবুল করার আদিখ্যেতা নেই।

খেলা খেলাই। খেলার গুণাগুণ বিচারের প্রশ্ন যেখানে গৌণ হয়ে যায় সেখানে দলের হারজিতের অঙ্কটাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মাথাচড়া ভাবটাই অনেক সময় জবরদস্তির চেহারা নেয়। তখন খেলা আর খেলা থাকে না। তখনকার বাড়াবাড়ির নজীরটিকে, আড়াআড়ির আঁচটিকে গোলাপী উপমাতে বেঁধে রাখতে মন চায় না। তাই যাদের ঘিরে এতো সব কাণ্ড, তাদের দ্বন্দ্বকে আমরা বাঘে-ভাল্লুকে লড়াইয়ের পর্যায়ে ফেলে 'গোলাপের যুদ্ধ' থেকে আলাদা করে রাখি।

কলকাতার মাঠে 'গোলাপের যুদ্ধ'-এ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হলো ভারতীয় রেলওয়ের দুই বাহু—পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব। কোন্ রেলের চাকা গড়গড়িয়ে চলে আর কার গতি হোঁচট খায় তাই দেখতেই কৌতূহল।

তেমন ডাকসাইটে আসর নয়। সবুজ গ্যালারিতে চাপাচাপি ভীড়ও নেই। বহুকণ্ঠের উচ্চকিত কলরোল, তাও নয়। কিন্তু যুদ্ধ জমেছিল! আর সেই জমাট বাঁধা অনুষ্ঠান ঘিরেই আমার প্রাপ্তিযোগ। দমকা হাওয়া মেশানো এক পশলা বৃষ্টিতে নেয়ে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাখানেকের অবকাশে ভিজে কাপড় শুকোয়ও নি। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার লগ্নে আর্দ্র অস্বস্তির কথা কেই বা মনে রেখেছে!

লীগের প্রথম খেলায় বি এন আর জিতেছিল। ফিরতি পর্বে ইস্টার্ণ রেল। বদলাবদলি হয়ে গেল। মর্যাদা ঘিরে দু পক্ষের যে দুশ্চিন্তা তা কম্‌লো। একবার ও পক্ষ জয়ধ্বনি তুললো। পরের বারে এ পক্ষ। কেউ ফাঁকিতে পড়লো না। এই তো ভাল, সাপও মরলো, লাঠি গাছটাও দুখণ্ড হলো না। দুপক্ষের সমর্থকেরাও সমান সমান সান্ত্বনার পুঁজি ঘরে তুলতে পারলেন।

এ পুঁজিতে আমার ভাগ নেই। আমার সঞ্চয় স্বতন্ত্র।

আমি দেখেছি খেলার মতো খেলা। ব্যক্তির মহিমা। দলগত ক্রীড়ারীতির পরিপাটী বিন্যাস। ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবং তাক লাগানো গোলের নজীর। সব মিলিয়ে পরশ পাথর পাওয়া। কোনো এক বিশেষ পক্ষের জয় দেখতে যাই নি। গিয়েছিলাম খেলা দেখতে। যা অভিপ্রেত তা পেয়েছি, হারজিতের মূল্য যার কাছে তুচ্ছ।

মাঠ প্রথম পর্বে ছিল ভিজে সপ্‌সপে। এই মাঠে পিচ পড়ে বল ছোটে দ্রুতগতিতে। ছুটছিলও। হঠাৎ ঘর্ষণের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না থাকতে পারলে মাঠের রূপান্তরিত অবস্থায় খেলোয়াড়েরা গোলমালে পড়ে যান। বলের গতি আন্দাজে তাঁদের ঠিকে ভুল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেদিন তেমন ভুলের ফাঁদে পা বাড়ান নি রেলের খেলোয়াড়েরা। পিচ্ছিল ঘাসের কারসাজী আগে টের পেয়ে ওঁরা মাঠের নাড়ীর খবর আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। কাজেই বল যতো ছুটেছে, ওঁরাও ততোই জোরে। আর দু তরফের

ছোটাছুটির ফাঁকে খেলার উর্দ্ধগতির সামগ্রিক লয়ও কেটে যায় নি। এই মাঠে যারা দ্রুত লয়ে ছুটতে পারেন তাঁদের বাহাদুরী আছে।

আধখানা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মাঠের চরিত্র বদলে গিয়েছিল। তখন হাওয়ার টানে জল শুকিয়ে ঘাসের নীচে কাদা জমতে স্বরু করেছে। আঠালো কাদায় গতিতে টান পড়লো। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিইয়ে রাখতে খেলোয়াড়দেরও বাড়তী মেহনতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হলো। প্রথম পর্বে সক্রিয় চিন্তার ভূমিকা ছিল বেশী। দ্বিতীয়পর্বে ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের। কিন্তু কোনো কাজেই কামাই পড়লো না। তাই শানানো প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশ শেষ মুহূর্তেও অটুট রইলো।

বিশ্রাম অন্তে বি এন আর ব্যবধান ঘোচাতে কোমর কষে চেষ্টা করেছে। এক সময় নিরবিচ্ছিন্ন বহুক্ষণ বলটি ইস্টার্ণ রেলের পেনাল্টি সীমানার কাছাকাছি বি এন আরের খেলোয়াড়দের পায়ে বা আয়ত্তে ঘোরাঘুরি করেছে। তবু খেলায় জিতেছে ইস্টার্ণ রেলওয়ে ২—১ গোলে এবং আরও গোলের সন্ধানে তাদের ফরোয়ার্ডেরা প্রায় নিশ্চিত প্রকল্প হাতে নিয়ে বারকয়েক ও প্রান্তে গোলের সামনে ঘোরাঘুরি করেছেন তখনও, যখন খেলায় বি এন আরের প্রাধান্য ছিল সন্দেহাতীত।

এক সুতোর ব্যবধানে ইস্টার্ণ রেলের জেতাটাই একমাত্র কথা নয়। বড় কথা এই যে তারা সেদিন আরও অনেক গোলের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতেও পারতো। পারতো এই কারণে যে ইস্টার্ণের ফরোয়ার্ডেরা বোঝাপড়ার সূত্র ধরে এগোবার চেষ্টা করেছিলেন। দলগত সংহতি গড়ায় তাঁদের নিষ্ঠা ছিল।

বি এন আরের আক্রমণাত্মক ভঙ্গী ছিল পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাঁরা মুস্কিল আসানের আশায় আপ্পালারাজুর দিকে বড্ড বেশী তাকিয়েছিলেন। ইস্টার্ণের ফরোয়ার্ড লাইন নির্ভর করেছে পাঁচজনের সম্মিলিত মূলধনের ওপর। প্রদীপ ব্যানার্জীর মতো জাত খেলোয়াড়ও

সেদিন পাঁচজনের একজন হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। তবে তা থাকলেও তাঁর স্বকীয় মুন্সীয়ানায় প্রাতিস্বিকতার পরিচয় ছিল। এবং সেক্ষেত্রেও প্রদীপের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দলের কাজে লেগেছে সবচেয়ে বেশী। ওই মুহূর্তে বোঝাপড়ার পথ ধরে ইস্টার্ণ রেল ছুটেছে হাল আমলের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনের নিঃখাঁজ গতিতে। তার পাশে মেহেনতী বি এন আরকে মনে হয়েছে যেন সাবেক আমলের ষ্টিম ইঞ্জিন। ষ্টিম ইঞ্জিন চলতে চলতে প্রতিপদেই ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে!

কোচিংয়ের আমলে ব্যক্তিগত দক্ষতার দাম কমিয়ে যাঁরা শুধু দলগত সংহতির ওপর জোর দেন আমি তাঁদের দলে নই। আমার ধারণা, ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়লে এবং সেই দক্ষতার সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে দলের দক্ষতারই পুঁজি বাড়ে। নইলে শুধু দিয়ে নিয়ে খেলার চেষ্টা করা হলে এক জায়গায় এসে সব চেষ্টা জট পাকিয়ে যায়। তখন গ্রন্থী উন্মোচনে প্রয়োজন ঘটে ব্যক্তির দক্ষতা। যে দক্ষতা প্রদীপ ব্যানার্জীদের আছে। সেই দক্ষতাই ফুটবলের মানকে উঁচু জাতে তুলে ধরতে পারে।

আর এই প্রদীপ ব্যানার্জী! বেশ ক বছর হলো ওঁকে দেখেছি। একালের ফুটবলারদের মধ্যে ওঁর তুলনা নেই। আগের কালের অনেক উইং ফরোয়ার্ডের চেয়ে ওঁকে আমি অসঙ্কোচে উঁচু আসন দিতে রাজী আছি। বছর কয়েক ধরে উঁচু মানের খেলা খেলছেন (তেমনি মাঠের মধ্যে সমানে বক্‌বক করে চলেছেন! কেন?) তবুও ইস্টার্ণ-বি এন আর ফিরতি খেলা দেখে এই প্রত্যয় আরও দৃঢ়মূল হয়েছে যে প্রদীপ তাঁর খেলোয়াড় জীবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছে গিয়েছেন। আগের চেয়ে এবার তাঁর খেলার মেজাজ আরও আঁটাসাটো, পরিচ্ছন্ন এবং স্বভাবতঃই সুন্দর। এখন তিনি রীতিমতো পরিণত ও প্রাজ্ঞ। ব্যক্তিসত্বাকে দলের স্বার্থে বিলিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। সেদিন তিনি যা করেছেন তাতেই সোনা

ফলিয়েছেন ! ওই দিনটার ফিরতি পথের দিকে তাকিয়ে থাকায় তাই আমার অনেক লোভ।

সেদিনের চোখ চেয়ে দেখার মতো একটি গোলও করেছেন আপ্পালারাজু। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসে টানও পড়ে নি। তবু আপ্পালারাজুর ব্যক্তিসত্বা দলের আত্মায় মিলিয়ে যেতে পারে নি। আপ্পালা নিজে খেলেছেন। সতীর্থদের খেলাতে পারেন নি প্রদীপের মতো। তাই প্রদীপের শিখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, লাবন্য ছিল। আর আপ্পালার চেষ্টায় বিক্ষিপ্ত লগ্নে দপ্ করে জ্বলে ওঠার প্রতিশ্রুতি।

আরও বলি, গোলের রাস্তা চিনে নিতে ইষ্টার্ণ রেলের ফরোয়ার্ডেরা সেদিন সুস্থ ও উজ্জীবিত চিন্তাকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলেন। সুস্থ চিন্তা মস্তো সম্পদ। সে মূলধন থাকলে মেহনতী রক্ষণব্যূহের পাঁচিলও টপকানো যায়। না থাকলে পাহাড় প্রমাণ পরিশ্রমও হয় বরবাদ। ফুটবলে লড়াই বাধে আক্রমণ আর রক্ষণভাগে। রক্ষণাত্মক পাঁচিল গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কঠিন কাজ গড়া পাঁচিলকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। 'গোলাপের যুদ্ধ-ভূমিতে' মেহনতে সাজানো মজবুত বাধাকে বুদ্ধির জোরেই একপক্ষ নড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তাই জয়লক্ষ্মীও যোগ্যের পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু জয়পরাজয়ের কথা থাক্। মস্তিষ্কের সুনিশ্চিত আত্ম-প্রকাশই এই খেলার সবচেয়ে বড় উপলব্ধি। মন, মাথা ঠিক থাকলে দেহও মস্তিষ্কের নেতৃত্ব মানতে বাধ্য হয়। আর তাতেই ফুটবলের মানোন্নয়নের সড়ক হয় সাফ্।

'গোলাপের যুদ্ধ'-এর আর একদিনের অভিজ্ঞতা।

এ এক আশ্চর্য্য খেলা !

যে পক্ষের হারার কথা সেই পক্ষই জিতে গেল। আর হারলো সেই পক্ষ—খেলার গুণগত বিচারে পরাজয় যার প্রাপ্য ছিল না। অনিশ্চয়তা নাকি শুধুমাত্র ক্রিকেটের পরম বৈশিষ্ট্য। ফুটবলের

নয়। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এই খেলাটির এমন হাল হবে কেন ?

বি এন আর বনাম ইষ্টার্ণে খেলার কথা। গুরুত্বপূর্ণ খেলা এটি—যদিও সবশুদ্ধের বিচারে ইষ্টার্ণ বনাম বি এন আর দ্বন্দ্বকে কলকাতার ময়দানের সেরা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া যায় না। সে মর্যাদায় নিরঙ্কুশ অধিকার ইষ্টবেঙ্গল—মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার। সে লড়াই বাঘে-ভাল্লুকে—রামে-রাবণে। নখদন্তের ধার কমে গেলেও যেমন বাঘ, তেমনি ভাল্লুকও। তাই তারা ওই এক মুহূর্ত্তের জন্যে নিজের স্বভাবে ফিরে যাবার চেষ্টা করে। আর যদি অপ্রস্তুত মুহূর্ত্তে বাঘ অথবা ভাল্লুকের উদ্যমে, সক্রিয়তায় ভাঁটার টান পড়ার উপক্রম ঘটে তাহলে তো একমাঠ দর্শক আছেনই। চেঁচিয়ে, হাঁকিয়ে, রাশ আল্‌গা উৎসাহের ফুটন্ত অভিব্যক্তিতে তাঁরা বাঘ-ভাল্লুকের বাঘা মেজাজ ফিরিয়ে এনে দেবেনই।

বি এন আর—ইষ্টার্ণের খেলা ঠিক সে পর্য্যায়ে পড়ে না।

দুই রেল সেদিন মুখোমুখি হয়েছিল ক্যালকাটা—মোহনবাগান মাঠে। রেলের চাকার মতো গড়গড়িয়ে বাধাহীন গতিতে এগিয়ে চলছিল বি এন আর। হঠাৎ পথ আগলে রুখে দাঁড়ালো ইষ্টার্ণ। শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারে নি বটে। কিন্তু যা পেরেছে তার মূল্য ফুটবল রসিক দর্শকদের কাছে সামান্য নয়।

এই খেলাতে ইষ্টার্ণ রেল পুরো দল নামাতে পারে নি। বর্মন নেই, বদলী গোলরক্ষক এন মণ্ডলও গরহাজির। তার ওপর অনুপস্থিত ইষ্টার্ণের বড় ভরসা প্রদীপ ব্যানার্জি। ইষ্টার্ণ রেলের মূল শক্তি তাদের ফরোয়ার্ড লাইনকেই ঘিরে। আর ফরোয়ার্ডদের মধ্যে সবার সেরা তো ওই প্রদীপ ব্যানার্জি। সুতরাং তাঁর এবং বর্মন-মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে খেলা সুরু হবার মুখে ইস্টার্ণের সমর্থকদের আশা গেল ভেঙ্গে এবং নিন্দুকে অপবাদও ছড়ালো, ইস্টার্ণ বি এন আরকে বেগ দিতে চাইছে না বলে।

কিন্তু সে অপবাদ মিথ্যে। খেলা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্টার্ণের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষকে বেগ দিতে, বাগ মানাতে এমন কষে কোমর বাঁধলেন যে সে বাঁধনে বি এন আরের অস্তিত্ব যেন আটকা পড়ে গেল।

একেবারে শুরুতে এবং শেষের ক' মিনিট ছাড়া সেদিন আর বি এন আরকে আক্রমণমুখী ভূমিকায় দেখি নি। দেখেছি, শুধু বাঁচার তাগিদে বিপক্ষকে প্রতিহত করায় ব্যস্ত থাকতে। কঠিন সে জীবন-সংগ্রাম। তবু তা জয়যুক্ত হয়েছে মূলতঃ একজনের কৃতিত্বে। সে কৃতিত্ব বি এন আরের গোলরক্ষক দীপক দাসের। প্রায় এক হাতে লড়েছেন তিনি। এক ঘুঁষিতে শম্ভু দাসচৌধুরীর স্থির, জোরালো সট ফিরিয়ে দলের প্রায় নিশ্চিত পতনরোধ করেছেন। দীপক ভাল খেলোয়াড়। তবে কতো ভাল তার যথার্থ হদিশ জানালেন সেইদিনেই।

এদিকে ইষ্টার্ণ রেল খেলছে অগাধ প্রত্যয়ে। তাদের ক্রীড়া-রীতির বিন্যাস পরিপাটি। ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতা যে তাঁদের অনেকটা অধিগত সেকথা বোঝাতেই যেন ইষ্টার্ণের ফরোয়ার্ডেরা পণ করেছিলেন।

ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতা হলো রিসিভিং, পাসিং ও কিকিং। ইষ্টার্ণের খেলোয়াড়রা অবশ্য সব সময়ে স্থির সট করতে পারেন নি। কিন্তু রিসিভিং, পাসিংয়ের অজস্র সফল নজীরে তাঁরা মাঠ ভরিয়ে তুলেছিলেন। ভিজে মাঠ, বলও ভারী। কিন্তু তাতেও তাঁদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি। যেন মুখস্থ বিদ্যাই তাঁরা বাস্তবে প্রয়োগ করে গেলেন।

হ্যাঁ, একেই বলে খেলা! এই খেলাকেই চোখ চেয়ে দেখতে হয়। আত্মস্থ হয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যতোক্ষণ দেখেছি ততোক্ষণই মন ভরে থেকেছে। আজকাল নাকি খেলা ভাল হয় না? খেলোয়াড়দের সে যোগ্যতা নেই! এই অভিযোগ অনেকেরই

মুখে মুখে ফিরছে। হয়তো সবদিন সব খেলা সত্যিই ভাল হয় না এবং সব খেলোয়াড়ও উপযুক্ত নন। কিন্তু এই একদিনে ইষ্টার্ণের খেলা সম্পর্কে ওই সব অভিযোগই খাটে কি? ওই একটি দিনকে কলকাতার সিনিয়ার লীগের সমস্ত প্রতিযোগী যদি প্রতিদিনে পরিণত করতে পারে তাহলে বোধ হয় মন থেকে অনেক আক্ষেপ মুছে যায়।

ইষ্টার্ণের খেলোয়াড়েরা খাটছিলেনও খুব। এমনিতেই ফুটবলের চাহিদা পরম পরিশ্রম। তার ওপর ভিজে মাঠের দাবী আরও বেশী। সে দাবীও তারা মিটিয়েছিলেন। প্রথম পনেরো মিনিট খেলা দেখে মনে হয়েছিল যে এতো পরিশ্রম ভার হয়তো ওঁদের সইবে না। শেষদিকে এলিয়ে পড়বেন। আর তখনই পাল্‌টা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে আসবে বি এন আর।

কিন্তু কই? এতো পরিশ্রমও তো ওঁদের হাঁফ ধরাতে পারলো না? তবু ইষ্টার্ণ রেল সেই খেলায় হেরে গেল। হারলো একটিমাত্র ছিদ্রের জের মেটাতে গিয়ে। সে ছিদ্র হলো দলের গোলরক্ষক।

নতুন মুখ এই গোলরক্ষকের। বড় আসরে নেমে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে বসেছিলেন। যখন তখন গোল ছেড়ে এগিয়ে আসছিলেন কিন্তু বলের নাগালে পৌঁছতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ওই এগিয়ে যাওয়া এবং বল ছুঁতে না পারাই হলো কাল। কর্ণার কিকের সময় হঠাৎ এগিয়েই তিনি বেসামাল। সঙ্গে সঙ্গে এক হেডে বাজীমাৎ করে দিলেন বলরাম।

শেষ চেষ্টা করেছিলেন ইষ্টার্ণ রেলের ফরোয়ার্ড দীনু দাস। পিছিয়ে পড়ে হেড করে বলরামের হেড ফিরিয়েও ছিলেন। কিন্তু ততোক্ষণে রেফারীর বাঁশীতে গোলের ঘোষণা জানাজানি হয়ে যায়।

রেফারীর নির্দেশ অমোঘ। সে নির্দেশে ইষ্টার্ণের কপাল ভাঙলো। তবুও তাদের খেলোয়াড়েরা রেফারীর সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুললেন না। তাঁরা তখন রীতিমতো উত্তেজিত, তবুও রা কাড়েন নি।

আমার বিশ্বাস, কলকাতার অন্য কোনো কোনো দলের বিপক্ষে রেফারী (তা তিনি যতোই ঘটনাস্থলের কাছাকাছি দাঁড়ান না কেন) যদি শেষমুহূর্তে এইভাবে গোলের নির্দেশ দিতেন তাহলে দলীয় খেলোয়াড়েরা মাথা নেড়ে, হাত উঁচিয়ে, গলা ফুলিয়ে অনেক কথা বলতে চাইতেন। আর সেই চাওয়া যে সেই মুহূর্তে দর্শকদের উসকানি জোগাতো, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইষ্টার্ণ রেলের খোলোয়াড়দের পথ স্বতন্ত্র। 'গোলাপের যুদ্ধে' নেমেও তাঁরা কাঁটা বিঁধোতে চান নি। তাই সেদিন তাঁরা গড়ের মাঠে এক আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। খেলার মতো খেলেও তাঁরা হারলেন। হারতে হারতেই তারা খেলোয়াড়চিত চরিত্রের বিজয় কেতন উড়িয়ে দিলেন আকাশে।

দর্শক হিসেবে আমার কাছে সেই ছবিটিই তো মস্তো সঞ্চয়।

বলরামের সেই সটটি !

আর সঞ্চয় বলরামের সেই সটটি ! সেওতো 'গোলাপের যুদ্ধের'ই আর এক কাহিনী। বলরামের সেই ফ্রি কিক্‌টি আজও মনের কোণে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে। শুধু আমার মনেই নয়, বোধ হয়, প্রত্যক্ষদর্শীদের সবাকার মনেই। ক্রীড়াকৃতির সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। মুছে ফেলা উচিতও নয়।

ফ্রি কিক্‌টি মেরেছিলেন ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে ফিরতি খেলার দিনে। বি এন আর এক গোলে পিছিয়ে, এমন সময় রেফারীর নির্দেশে বলরাম ফ্রি কিক্‌ করার সুযোগ পেলেন।

ঘটনাস্থল ইস্টার্ণের পেনাল্‌টির সীমানার ঠিক বাইরে, মাঠের মাঝ অঞ্চলে। বল বসাবার আগে ইস্টার্ণ রেলের সমস্ত খেলোয়াড় এক লাইনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটি নিশ্ছিদ্র রেখা বা প্রাচীর গড়ে রাখলেন। যাতে ফ্রি কিকের পর বলটি কোনো ফাঁক গলে গোলের মুখে ছুটতে না পারে।

ইস্টার্ণের খেলোয়াড়দের গড়া প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে বল গলার রাস্তা নেই। তাই সোজা পথ না ধরে বলরাম ঘোরালো পথের সন্ধানে এগোলেন। ঘোরালো মানে বাঁকা পথ। সট করে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বলের গতিপথ ধনুকের মতো গড়ে তোলারই পরিকল্পনা।

আর সে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে বলরাম কি দক্ষতাই না দেখালেন !

ইস্টার্ণের গোলপোষ্ট ছিল মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে। বলরাম সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তাঁর মুখ, বুক, সারা দেহ রইলো একমুখী লক্ষ্যে,—দক্ষিণের বদলে পূব-দক্ষিণ কোণে। হেলে।

তারপর পূব-দক্ষিণে তাকিয়ে বাঁ পায়ে বল কিক্ করে পাটিকে চকিতে টেনে নিলেন।

সেই টানে বলেও টান্ পড়লো। ঘুরতে সুরু করলো। প্রথমে বল ছুটলো পূব মুখে। তারপর যেই ইস্টার্ণের খেলোয়াড়দের গড়া প্রাচীর অতিক্রান্ত হয়ে গেল অমনি বাঁকানো পথে বল ফিরে এলো দক্ষিণের গোলাভিমুখে। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে পোষ্টে গিয়ে ধাক্কা। যেন আধখানা বুমেরাং। চলেছিল একদিকে, হঠাৎ বাঁক ফিরে অন্যমুখে গতি বদল করে নিলো।

এনন আকস্মিক পরিবর্তন যে ঘটতে পারে তা অনেকেরই ধারণায় ছিল না। সম্ভবতঃ ইস্টার্ণ রেলের গোলরক্ষকের নয়। তাই তিনি কিছু করে ওঠার আগেই বলটি পোষ্টে ধাক্কা লাগিয়েই আবার ঘুরপথে মাঠের পশ্চিম ধারে সরে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বলরাম যখন সট নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তাঁর একপেশে গতিভঙ্গী দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তিনি বলের গতিপথ বাঁকাবার চেষ্টা করবেন। পাশের আসনে ছিলেন ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ফুটবল কোচ শ্রীস্বরাজ ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার বলরাম-পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু চোখের পলক ফেলার আগেই চোখের সামনে যা ঘটে গেল তা স্বরাজ বা আমি কেউই বিন্দুমাত্র আর আলোচনার ফুরসৎ পাই নি। শুধু স্বতঃস্ফূর্ত তারিফে হাততালি বাজিয়ে চলেছিলাম। তালি বাজিয়ে যে কতক্ষণ কাটিয়েছিলাম তাও জানি না। সত্যিই, আমাদের কোনো হুঁস ছিল না। বিস্ময়ে, আনন্দে, অভিনন্দনে সেই মুহূর্তে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অল্পস্বল্প ফুটবল আমরা সকলেই খেলেছি। সট করার সময় পরিকল্পিত পায়ের টান অক্ষুন্ন রাখা গেলে শূন্য পথে বলের গতি যে বাঁকানো সম্ভবপর হয় তাও জানি। কিন্তু

এতোখানি বাঁক ফেরাতে আমাদের দেশের কোনো খেলোয়াড় যে সিদ্ধহস্ত তা জানা ছিল না। বলরামের সেই ফ্রি কিক্‌টি দেখে সেদিন এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি। আর সে সংশয় মোচনে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি আশ্বাসও।

নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে স্বতন্ত্র পথে ফ্রি কিক্‌ করে বলরাম যেন মুখস্থ বিদ্যা গড়গড় করে আউড়ে গেলেন। তাঁর প্রত্যয়, পরিচ্ছন্ন প্রয়োগ রীতি এবং সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে এমন সট তিনি যখন তখন, বিনা নোটিশেই করতে পারেন। প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার প্রমোদ দাসগুপ্ত বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপের খেলার একটি নজীর উল্লেখ করে আমায় জানিয়েছেন যে সেদিনও বলরাম অনুরূপ একটি ফ্রি কিকে গোল করেছিলেন। কতো তৈরী থাকলে একজন খেলোয়াড় এইভাবে ব'লে ব'লে শূন্য পথে বলের গতিপথ এতোখানি বাঁকাতে পারেন। সেই প্রস্তুতির মূলে সনিষ্ঠ অনুশীলন ও সাধনার পরিমাণও বা কতোখানি। যিনি এমন দৃষ্টান্ত রাখতে পারেন নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলনে তিনি যে ব্যক্তিগত দক্ষতাকে সহজ এবং সহজাত করে তুলেছেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

কিক্‌ করে, উল্‌টো প্রান্তের কর্ণার কিক্‌ নয়, সরাসরি সটে বলে পাক্‌ ধরাতে, ক্রিকেটের পরিভাষায় যাকে বলে সুইং, তা ধরাতে, সোজা কথায় বলের বাঁক ফেরাতে ইদানীংকালে আরও কজনকে দেখেছি। যথা প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, অরুময়নৈগম, সন্তোষ চ্যাটার্জী এবং আরও কজনকে। তাঁদের সাফল্যের এই সব দৃশ্য থেকে কি বোঝা যায়?

বোঝা যায় যে শিক্ষনে, অনুশীলনে সুফল ফলছে। একালের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়ামান ক্রমশঃই নামছে—অসন্তুষ্ট সমালোচকের মুখে একথা যতোই উচ্চারিত হোক না কেন, কোনো কোনো বিভাগে একালে কেউ কেউ যে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছেন

তা অনস্বীকার্য। চিপিং বা সট করার কালে পায়ের চেটোর সাহায্যে বলটিকে মাটিতে চেপে দিয়ে ধনুকের মতো বক্রপথে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠানো অথবা সুইংগিং সট নেওয়ায় একালের জুড়ি আগের কালে ছিল কি ?

তবে একাল ও সেকালের মধ্যে কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণে আমি জড়াতে চাই না। কারণ দুয়ের মধ্যে অবস্থাগত পার্থক্য এতোই যে তুলনার চেষ্টা করাই বোকামী মাত্র। সেকালের ফুটবলের চরিত্রে এমন অনেক কিছু ছিল যা একালে নেই, থাকতে পারেও না। আবার একালের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যা আছে সেকালের তা ছিল না এবং থাকতে পারেও না।

যাক সে কথা। আমি শুধু বলতে চাই, শিক্ষনে ও অনুশীলনে বর্তমানে কিছু কিছু সুফল যে হাতে নাতে পাওয়া যাচ্ছে বলরামের সেই ফ্রি কিক্ই তার অভ্রান্ত প্রমাণ। সুতরাং কোমর বেঁধে নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া হোক।

খেলোয়াড়েরা শিক্ষা করুন। আর সেই সঙ্গে আমরা দর্শকেরাও যেন শিক্ষালব্ধ ফলশ্রুতির যথার্থ মূল্যায়নে কার্পণ্য না করি। ভাল জিনিস যেন আমাদের মনে দাগ কেটে রাখতে পারে। মন থেকে স্বতঃস্ফুর্ত স্বীকৃতি ও তারিফ আদায় করে নিতে পারে। আমাদেরও কর্তব্য আছে। আর সে কর্তব্য শুধু গোল দেখেই গলে পড়ার চেয়ে অথবা সমর্থিত দলের লীগ—শীল্ড জয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত, আত্মস্থ থাকার চেয়েও অনেক বড়।

খেলোয়াড়েরা ভাল খেলবেন, বড় কাজ করবেন, এই যখন আমাদের প্রত্যাশা তখন তাঁদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, পৃষ্ঠপোষকতা জানানোও কি আমাদের মানে, দর্শকদের পক্ষে বড় কাজ নয় ? আমরা প্রত্যাশামুখী। খেলোয়াড়েরাও তাই। তাঁরা চান প্রেরণা। তাঁরাও আছেন আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে যেমন আমরা আছি ওঁদের ভাল খেলার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে।

কথায় কথায়

গ্যালারির গায়েই ঝুলন্ত মাইক। বেতার অনুষ্ঠান চলছে। কথক ফুটবলে তিন পুরুষ। আমার কাজ খেই ধরিয়ে দেওয়া। গ্রন্থণা।

গোষ্ঠ পাল, করুণা ভট্টাচার্য ও প্রদীপ ব্যানার্জি। তিনজন পাশাপাশি দাঁড়ালে পটভূমিকায় ভেসে ওঠে কলকাতার ফুটবল ইতিহাসের এক একটানা ছবি। শুধু কলকাতারই বা বলি কেন, বলা উচিত ভারতীয় ইতিহাসেরই ছবি।

ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়েছে অনেক আগে। সেই প্রাক্ প্রথম মহাযুদ্ধকালে গোষ্ঠবাবুকে ঘিরে। তবে এখনও আঁকজোক সারা হয় নি। গোষ্ঠবাবু, করুণাবাবু অবসর নিলেও, প্রদীপ ব্যানার্জি এখনও খেলোয়াড় হিসেবে জীবন-মধ্যাহ্ন।

তিনপুরুষের তিন প্রতীককে এক জায়গায় একমুহূর্তে দেখবার সুযোগ বড় একটা আসে-না। এলো যখন তখনই আসল কথাটি গোড়াতেই পেড়ে বসলাম।

আসল কথা কি? আসল কথা আমাদের ফুটবলের প্রকৃত মানের প্রসঙ্গ।

জানি, মান শব্দটি আপেক্ষিক। খেলার মাঠ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খেলোয়াড়দের সামাজিক জীবনধারা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরীক্ষা—সবকিছুর বিচার বিশ্লেষণ করা গেলেই ফুটবল খেলার মানের যাথার্থ যাচাই করা যেতে পারে।

কাজটা আরও কঠিন যেহেতু ফুটবলের মান বাড়ছে না কমছে তা বোঝাতে অ্যাথলেটিক বা সাঁতারের মতো ঘড়ির কাঁটা কোনো সাহায্যই করতে পারে না। শুধু চোখে দেখে আর মনে মনে মিলিয়ে মোটামুটি ধারণা করে নিতে হয়।

কাজটি সত্যিই শক্ত। তবুও শক্ত কাজ হাতে দেওয়ায় আজ ক্রীড়ানুরাগীদের লোভের শেষ নেই। কথায় কথায় তাঁরা রায়ও দিয়ে বসেন যে আমাদের ফুটবল আজ অনেক তলায় নেমেছে সেকালের অনুপাতে।

সাফ্ কথা সাধারণের। তাঁদের সামনে আজ খেলোয়াড় হিসেবে গোষ্ঠ পাল নেই, কুমার নেই, নেই সামাদ ও হাফিজ রসিদ। সুতরাং একালের ফুটবলের জাতও নেই, এই তাদের আক্ষেপ! আক্ষেপের কারণ একেবারে যুক্তিবিহীন নয়। তবু কেমন যেন একপেশে, একদেশদর্শী।

তাই তিন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারাই বলুন না, আমাদের খেলার মান বাড়ছে, না কমছে?

উত্তরে যা পেলাম তাতে মনের অস্পষ্টতা তো কাটেই নি। বরং বেড়েছে। গোষ্ঠবাবু আর প্রদীপ ব্যানার্জির অভিমত ঠিক দুটি বিপরীত বিন্দুর দিকে বাঁক ফিরলো। আর মধ্যপথ বেছে নিলেন সেকাল ও একেবারে হাল আমলের মাঝামাঝি যিনি খেলেছেন তিনিই। অর্থাৎ করুণা ভট্টাচার্য।

গোষ্ঠ পালের মতে,

বৃটিশ মিলিটারি দলগুলি সরে পড়ায় উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। সেকালে গোরাদলগুলিই ছিল ফুটবলের অত্যুচ্চ মানের ধারক ও বাহক। তখনকার খেলোয়াড়দের শরীর ছিল মজবুত আর মন ছিল সনিষ্ঠ। শরীরে সামর্থ্য ছিল, মনে ছিল স্ফূর্তি। এই মন আর শরীর দিয়েই অনেকে দক্ষতার ঘাটতি পুষিয়ে দিতে পারতেন।

সেকালের ভারতীয়দের সটে জোর ছিল। নিশানা ছিল স্থির। আর বুদ্ধি নিশ্চয়ই ভোঁতা ছিল না। বুদ্ধিতে টান্ পড়লে কি তাঁরা সবল, সবুট প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্রীড়া কৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন?

তবে হ্যাঁ, সে আমলে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল অল্প কজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় দলের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। কাজেই বাছাই করে, ছেঁকে শুধুমাত্র ভাল খেলোয়াড়দের জন্যেই বড় আসরে পংক্তি সাজানো হোতো। হয়তো তাই নজরে পড়েছেন একমাত্র তাঁরাই যাঁদের দক্ষতা প্রশ্নেরও অতীত।

তখন প্রশিক্ষণের বালাই ছিল না। এখন হয়েছে। কিন্তু শিক্ষালব্ধ দক্ষতার প্রত্যক্ষ পরিচয় একালে মেলে কই? গোলের সহজ সুযোগগুলি একেবারে দরাজ মেজাজে হাতছাড়া করা হয় কেন? কেনই বা বল আয়ত্তে আনতে জনে জনে হিমসিম খেয়ে যান? সমমানের খেলা দেখানো আজকাল অনেকেরই অসাধ্য।

সত্যি বলতে কি, সেকালের খেলা দেখে আনন্দ পাওয়া যেতো। খেলা শেষে ব্যক্তি বিশেষের খেলার তারিফে খোসগল্প জুড়ে দিয়েই দর্শকেরা ঘরে ফিরতেন। আর একালে? একালে খেলা দেখে আনন্দ পান কজন?

গোষ্ঠবাবুর সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে একালের খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জি আনন্দ পাচ্ছিলেন না। তাই তাঁর যখন কথা বলার পালা এলো তখন কেমন করে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে যাবেন সেইটিই হলো সমস্যা।

প্রদীপ বললেন,

সেকালের ফুটবল সম্পর্কে কোনো ঝথা বলার অধিকার আমার নেই। যেহেতু আমি সেকালের প্রত্যক্ষদর্শী নই। তাছাড়া কোনো বিতর্কেও আমি জড়াতে চাই না।

কিন্তু তিনি জড়াতে না চাইলেও বিতর্কের সুরটি তাঁকে শেষপর্যন্ত জড়িয়েই রাখলো। এ পরিস্থিতি অবশ্য অনিবার্যই ছিল। কারণ মূল প্রসঙ্গটির মূলেই মত এবং অমতের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

প্রদীপ ব্যানার্জীর অভিমতে,

ঘরোয়া মাঠে আজকাল অবশ্য বৃটিশ সেনাদলের দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নেই। কিন্তু আরও জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে আন্তর্জাতিক আসরে। ওলিম্পিকে এবং এশীয় ক্রীড়াভূমিতে। সেখানে আজকাল পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ভারতীয় ফুটবলের জাত যাচাই করা হয়।

এইসব পরীক্ষার আয়োজনে ভারত কি করতে পেরেছে? ভারত জাকার্তা ক্রীড়ার স্বর্ণপদক পেয়েছে এবং রোমে জিততে না পারলেও, কোনো খেলাতেই শোচনীয়ভাবে হারে নি। অমন জাঁদরেল দল হাঙ্গেরীও ভারতকে ২—১ গোলের বেশী ব্যবধানে পরাজিত করতে পারে নি।

প্রদীপ আরও দৃষ্টান্ত রাখলেন,

মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ভারত খুব সহজেই হারিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়াকে। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বাছাই আই, এফ, এ দল অষ্ট্রেলিয়া সফরে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। এবং সেকালের আই, এফ, এ দল মানেই তদানীন্তন ভারতশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল।

আগেকার অনুপাতে এখন হয়তো ভারতীয় খেলোয়াড়দের শারীরিক সামর্থ্য তেমন নয়। তবুও একালের খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক ফুটবলে পুরো নব্বই মিনিট খাটতে হচ্ছে এবং বুটের ওজনটিকে সর্বদাই পায়ে চড়িয়েও রাখতে হচ্ছে। এর ওপর দৈনন্দিন অনুশীলনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়েও তো ফেলতে হয়।

পরপর দুটি ওলিম্পিকে খেলার সুযোগ এসেছে আমার জীবনে। তাছাড়া এশীয় ফুটবলের বছর আষ্টেকের মান আমার জানা। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মান ক্রমশঃই বাড়ছে। ভারতীয় ফুটবলের মান যদি কমতে থাকে তাহলে আশপাশের বাড়ন্ত মানের সামনে ভারত টিঁকে থাকতে পারতো না। তাই নয় কি?

প্রদীপের কথায় ছিল গোষ্ঠবাবুর অভিমতের বিপরীত সুর। মুখে মুখে ওঁরা পরস্পরের সঙ্গে ঝাঁঝালো তর্ক জুড়ে দেন নি। না গোষ্ঠবাবু। প্রদীপ তো নয়ই। তবুও মনে মনে ওঁরা দুজনেই স্বতন্ত্র পথে চলছিলেন।

দুজনের কথায় কোনো উত্তাপ ছিল না সত্যি। কিন্তু দু-মুখী মতামতের সূত্রে অস্বস্তি দানা বাঁধার উপক্রম ঘটছিল। আমিই কথাটা পেড়েছিলাম। তাই আমার অবস্থা তখন রীতিমতো সঙ্গীন! হঠাৎ করুণাবাবুর কথায় সেই মুহূর্তেই একটা আপোষ-রফা হয়ে গেল।

করুণাবাবু বললেন,

কি দরকার এমন চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের? আমি বরং বলি যে এ আলোচনা আপাততঃ উহ্য থাকুক। সে যুগ ও এ যুগের পরিস্থিতি একেবারেই স্বতন্ত্র। এখন আমাদের পায়ে বুট এসেছে, তখন যা ছিল না। ক্রীড়াধারার আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। খেলার প্রথা প্রকরণে বেধেছে বিপ্লব। সবকিছুরই রূপান্তর ঘটেছে। সুতরাং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে একালকে যাচাই করা হয়তো সঙ্গত হচ্ছে না।

তবে একথাটা খাঁটি যে সেকালের ফুটবলে ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। একালে আধুনিক প্রকরণই মুখ্য। অধিগত প্রকরণের কল্যাণে দক্ষতা বাড়াতে আজকাল যে তোড়জোড় চলেছে তাও অনস্বীকার্য।

প্রস্তুতিতে নিষ্ঠা থাকলে যে কাজ হয় তার প্রমাণও পেয়েছি। অন্য সময়ে যে যাই খেলুন না কেন, একালের খেলোয়াড়েরা ভারতীয় দলের পক্ষে যখনই মাঠে নেমেছেন তখনই তাঁদের উজ্জ্বলতর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছি। আরও বড় প্রমাণ জাকার্তা ক্রীড়ার ফলাফল।

করুণাবাবুর মতে,

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও আজকাল ভারতকে আট-দশ

গোলের ব্যবধানে হারতে হয় না। যেমন হয়েছিল হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে। ছক বাঁধা পদ্ধতি অনুসরণের ফলেই বোধহয় ভারতীয় দল অগুন্তি গোল হওয়ার ফাঁকা রাস্তাটা আগলে রাখতে পারছে। এখন গোল করার সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া গেলেই হয়।

অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবল বর্তমানে ঠিক পথের বাঁকেই এসে দাঁড়াতে পেরেছে। ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হলে অনেক আক্ষেপ মিটে যাবে। হয়তো করুণাবাবুর এ উপলব্ধিই সত্য। আর মিথ্যে হলেই বা উপায় কি আছে ?

হাল ছাড়লে তো চলবে না। আশায় ও প্রত্যাশায় বুক বেঁধে ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। আর সমস্ত আশা, প্রত্যাশাও এই একটি প্রকল্পকেই ঘিরে। সে প্রকল্প প্রশিক্ষণের, অনুশীলনের।

ফুটবলে সাফল্য লাভের পথে দক্ষতার বিকল্পে যেমন আর কিছুই নেই, তেমনি দক্ষতা অর্জনে শিক্ষা ও অনুশীলন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। অতএব ভারতীয় ফুটবল যেন প্রশিক্ষণে ও অনুশীলনে নিষ্ঠা দেখাতে পারে। অনুশীলনে কৌশল রপ্ত হয়। প্রশিক্ষণে ক্রীড়ারীতির সঙ্গে বুদ্ধির সুসমঞ্জস সমন্বয় ঘটে।

এই সমন্বয়ই ভারতীয় ফুটবলের একান্ত বাঞ্ছিত। এগিয়ে যাওয়ার পথে পরম পাথেয়।

আর একদিন বৈঠকী আসর জমিয়েছিলাম একালের দুজন খেলোয়াড় আর দুজন কোচের সঙ্গে। কোচ অমল দত্ত ও অরুণ সিংহ এবং খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী ও সুকুমার সমাজপতি।

ওঁরা প্রত্যক্ষ্যে ঘরোয়া ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। ওঁদের অভিজ্ঞতা, সমস্যার কথা জানতে পারলে কলকাতার ফুটবলের অন্দর মহলেরও কিছু খোঁজ খবর পাওয়া যায়। সেই খবরের আশাতেই চারজনকে একই সঙ্গে পাকড়াও করেছিলাম।

প্রশ্ন রাখলাম অরুণ সিংহের সামনে, লীগ খেলা কেমন দেখলেন ?

ভালই, জবাব পেলাম। লীগ ঘিরে উৎসাহ যথারীতি দানা বেধেছিল। উত্তেজনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সবই ছিল। আর যে অনুষ্ঠানে জীবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে সে অনুষ্ঠান রসিক মনে দাগ কাটবেই। এবং সে দাগ জলের রেখাও নয় যে চট করে মুছে যাবে। তাই লীগের প্রভাব থেকে আমার মন এখনও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি।

খেলার মানের কথা বলুন, আমি শুধালাম। উত্তর দিলেন অরুণবাবু,

দেখুন, আমাদের খেলার মান নিম্নমুখী এ কথায় আমার সায় নেই। লীগ খেলার মান যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা সন্তোষজনক না হলেও আশ্বাসজনক তো বটেই। ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু ঘটেছে। তবে মাত্র বছর কয়েক হলো একটি নতুন ক্রীড়ারীতিতে আমরা অভ্যস্ত হতে চলেছি। অনভ্যাসের জের চলেছে। শুধরে নিতে সময় লাগবে বৈকি।

নতুন ক্রীড়ারীতি তিনব্যাক-চারব্যাক প্রথা। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যার কাঠামো সাজানো। একসময় ভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা খেলতাম। আজ চেষ্টা করছি তিনব্যাক-চারব্যাক প্রথা অনুসরণে। সুতরাং পুরাণো প্রথা ছেড়ে নতুন ব্যবস্থাকে সইয়ে নিতে যেটুকু ঘাটতি ঘটা স্বাভাবিক তা হয়তো ঘটেছে। তবে আমার বিশ্বাস, একদিন এ ঘাটতিও শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

নতুন ক্রীড়ারীতি বা তিনব্যাক-চারব্যাক প্রথা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের মনোভাব জানতে চাইলে অরুণবাবু বললেন,

এই রীতিকে তাঁরা সবাই স্বাগত জানিয়েছেন। অমল দত্তের অভিমতও অভিন্ন। তাঁর কথায়,

তিনব্যাক প্রথা সম্পর্কে খেলোয়াড়দের আগ্রহ আছে। তাঁরা সত্যিই এই ক্রীড়ারীতি সম্পর্কে সচেতন। তবে নতুন পদ্ধতিতে রপ্ত হতে হলে ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা চাই।

আমাদের দেশে প্রতিযোগিতামূলক খেলার ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত। কিন্তু অনুশীলনের আয়োজন নামমাত্র। লীগ খেলতেই খেলোয়াড়েরা দীর্ঘদিন ব্যস্ত। অথচ প্রস্তুতিপর্বে অনুশীলনে তাঁরা সময় পান সামান্যই। এগিয়ে যাওয়া সব দেশেই অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী, প্রতিযোগিতামূলক খেলার সংখ্যা কমিয়ে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হবার উপায় নেই।

আর সে উপায় নেই বলেই দীর্ঘ মরশুমে লীগ-ম্যাচ, কলেজ ও অফিসের খেলা খেলে প্রায় সব খেলোয়াড়রাই হাঁপিয়ে ওঠেন বা অল্পবিস্তর আঘাত পান। ফলে লীগের পর তাঁরা যে কি করে শীল্ডের খেলা চালিয়ে যাবেন সেইটিই হয়ে দাঁড়ায় এক মস্তো সমস্যা।

আরও বল্লেন অমল,

সামনেই শীল্ড খেলা! এই ফাঁকে শিক্ষা শিবিরে রোজই আমায় খেলোয়াড়দের মুখ থেকে শুনতে হয়, আমায় কদিন বিশ্রাম দিন্। সবাই যদি বিশ্রাম চান তাহলে প্রস্তুতিতে কি ভাঁটা পড়ে না? আর বিশ্রাম না দিয়েই বা কি করা যায়! মানুষের শরীর তো। একটানা পরিশ্রম করে চলেছে। বিশ্রাম না পেলে ভেঙ্গে পড়তে কতোক্ষণ?

সমাজপতি পাশেই ছিলেন। অমলের বক্তব্যটা যেন ছোঁ মেরেই লুফে নিলেন তিনি।

আমারও সেই কথা—আমাদের বিশ্রাম চাই। যতোদিন লীগ চালু ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানে বাড়তি পরিশ্রমের চাপ বুঝতে পারিনি। বুঝতে চাইও নি। কিন্তু যেই চ্যাম্পিয়ানশিপের মীমাংসা হয়ে গেলো অমনি উপলব্ধি করলাম যে শরীর, মন, দুই এখন বিশ্রাম চাইছে। এই বিশ্রামে যদি বঞ্চিত থাকি তাহলে শীল্ডে কখনই ভাল বা সাধ্যমতো খেলা সম্ভবপর নয়।

খুব খাঁটি কথা বলেছেন সমাজপতি। বেচারী লীগের সবকটি ম্যাচ, গুনে গুনে আটাশটি খেলায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন।

বিশ্রাম চাওয়ায় ওঁর দাবী শুধু স্বাভাবিকই নয়। অতি সঙ্গতও বটে।

কিন্তু এ দাবী কি একা সমাজপতির? বোধহয় সব খেলোয়াড়েরই। আর সে দাবী না মিটিয়ে তাঁদের কাছে ভাল খেলা দেখানোর দাবী জানানোও নিরর্থক। ওঁদের কথায় চিন্তার খোরাক আছে। এ নিয়ে ফুটবলের ব্যবস্থাপকেরা যদি মাথা না ঘামান তাহলে দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেললেও কলকাতার ফুটবলের সামগ্রিক মানোন্নয়নের রাস্তা সাফ হবে না।

সমাজপতিকে একটি ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসাও করেছিলাম।

আচ্ছা, লীগের কোন্ ম্যাচটি খেলে এবার আপনি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন?

ভাবছিলাম, উনি বলবেন বুঝি দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানকে হারিয়ে। অথবা বি এন আর-ইস্টার্ণ রেল বা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে কোন খেলা। কিন্তু না। ও সবের কোনটাই নয়।

সমাজপতি বল্লেন,

হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে খেলে। সেদিন আমাদের দলগত সংহতি পৌঁছেছিল আদর্শ পর্যায়ে। আমরা যা করেছি তার কোনটিই বৃথায় যায় নি। সব কিছুরই একটা মানে খুঁজে পেয়েছিলাম। খেলা ভাঙ্গার পর দলের সবাই মিলে সেদিনের খেলা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে খুসী হয়েছি। কিছু শিখতেও পেরেছি সেই সঙ্গে।

ঠিক এমনি এক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ রেখেছিলাম চুনী গোস্বামীর সামনে,

উত্তরে জানলাম,

ফিরতি লীগে বি এন আরের সঙ্গে খেলেই এবার আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। মরশুমের শুরুতে নানান কারণে আমি তেমন প্রস্তুত ছিলাম না। শুরুতে অনেককে নিরাশ করেছি। কিন্তু সেদিন বোধহয় কিছুটা ভাল খেলে এবং দিনের একমাত্র গোলটি করে

দর্শক-সমর্থকদের প্রত্যাশা, সামান্য হলেও, মিটিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

আর বি এন আরের সঙ্গে ফিরতি লীগের খেলা ছিল আমাদের কাছে মর্যাদার লড়াই। আগের ম্যাচে হেরেছিলাম কিনা।

চুনী বল্লেন,

তাছাড়া আমাদের সবায়ের ধারণা হয়েছিল যে বি এন আরকে যদি হারাতে পারি তাহলে বোধহয় লীগও পাবো। কার্যতঃ হলোও তাই।

এই বি এন আর এবং আর এক রেলদল, ইস্টার্ণের খেলা সম্পর্কে চুনী বেশ বড়সড় সার্টিফিকেট দিলেন। বল্লেন, ওরা সত্যিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলার চেষ্টা করেছে এবং মাঝে মাঝে সফলও হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট চুনীর মুখ থেকে বেরুলো ইষ্টবেঙ্গল সম্পর্কে।

বল্লেন তিনি,

মোহনবাগান লীগ পাওয়াতে আমি যে খুব খুসী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ইষ্টবেঙ্গলের ভূমিকা সম্পর্কে আমার অভিমত কিন্তু কারুর চেয়ে খাটো নয়। সব প্রতিযোগীর চেয়ে ইষ্টবেঙ্গলেরই বেশী প্রশংসা করি। কারণ, অন্যবারের অনুপাতে এবার ইষ্টবেঙ্গলের শক্তি কিছুটা কম ছিল। অন্ততঃ কাগজে-কলমে। কিন্তু কাজের বেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল যেভাবে এগিয়ে এসেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভাঙ্গাদল ইষ্টবেঙ্গল যে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে তা আমি কেন, অন্য কেউই কি ভাবতে পেরেছিল?

ফুটবলে ভেজাল !

কিন্তু যে ফুটবল লীগকে নিয়ে কলকাতার মাঠ উৎসাহ, উদ্দীপনার বন্যায় অহোরাত্র হাবুডুবু খাচ্ছে, সেই লীগের কি হাল হয়েছে তা ভাববার মতো !

শুধু এক বছরের জন্যেই নয়, কলকাতার ফুটবল লীগে ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থা পরপর তিন বছরের জন্যে পাকা করে রাখা হ'ল। লীগ অথচ ওঠানামা থাকবে না। প্রতিযোগিতা কিন্তু এই আসরে হার ও জিতের মূল্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন গুরুত্ব পাবে না। নামে লীগ। কিন্তু এর চেয়ে বড় ভেজাল আর কিই বা থাকতে পারে !

ভেজালই তো এই কালের অনেকখানি ! এ যুগের বড় কারবারী যারা তাদের হাত আজ চালে-ডালে, তেলে-দুধে এবং জীবনের অন্য ক্ষেত্রেই শুধু সক্রিয় নয়। সেই হাতের কালিমাখা ছাপ খেলার মাঠেও পড়েছে। তাই স্বাস্থ্য সাজাতে, চরিত্র গড়তে যে খেলার মাঠকে আমরা জীবনে খেলার পাশেই আসন দিতে চেয়েছিলাম, সেই মাঠ শেষ পর্যন্ত বন্ধ্যাত্ব বরণ করে নিয়েছে। ওখানে ফসল ফলানোর আশা দূরাশা। জমিতে সার পড়ে নি। সারের নামে ভেজাল ছড়ান হয়েছে অকৃপণ মেজাজে।

অথচ কলকাতার ফুটবল মাঠ একদিন এমন অনুর্বর ছিল না। থাকবে কি করেই বা ? সে তো বাংলাদেশেরই মাঠ এবং মাটি !

সেই মাটিতে পা রেখে বাংলার ছেলেরা তখন খেলতেই শিখেছিল। খেলার আনন্দে মাততে, দু হাতে আনন্দের উপকরণগুলিকে বিলিয়ে দিতে। তারা জেনেছিল যে খেলা মানেই জেতা এবং হারা। জিতে সান্ত্বনা পেত। হেরে গেলেও তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে যেত

না। হারতে হারতে তারা বিজয়পথের পাথেয় কুড়িয়ে নিতো। প্রত্যয়ে ও দক্ষতায় গড়া সেই পাথেয় ছিল শান্ দেওয়া ইস্পাত। সেইটুকু সম্বল করে তারা গুরুমারা বিদ্যেও অধিগত করে নিয়েছিল। তখনকার খেলা দেখে বাংলাদেশের বুক ফুলে উঠত।

কিন্তু সে দিনটি গত হয়েছে অনেক দিন। কাল থেকে কালান্তরে এসে জীবনের আরও পাঁচটি ক্ষেত্রের মতই আমাদের খেলার মাঠের মানুষেরাও যে মুহূর্তে খেলাধূলায়ও ভেজাল মেশাতে শিখল সেই মুহূর্তেই বৃহত্তর শিক্ষার মূল্যবোধ তাদের চোখে এতটুকু হয়ে দাঁড়াল। তাদের কাছে তখন থেকে আর খেলা বড় নয়। ক্রীড়াগত আদর্শ তুচ্ছ। সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল নিজেদের স্বার্থ।

কোথায়ও ব্যক্তিগত সুবিধা, কোথায়ও শ্রেণীগত মুনাফা ঘিরে সেই স্বার্থের অস্তিত্ব গড়া। ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীস্বার্থকে ইহকাল-পরকাল মনে করার উৎকট ইচ্ছের প্রথম বর্হিপ্রকাশ ঘটেছিল কলকাতার ফুটবল মাঠে ১৯৫২ সালে।

কলকাতার ফুটবলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার হাল ধরে বসেছিলেন যিনি সিনিয়ার লীগ প্রতিযোগী বলে তাঁর নিজস্ব একটি দল ছিল। সেই দল সেবার ক্রীড়া দক্ষতার বিনিময়ে খেয়া পারের কড়ি জোগাড় করতে পারে নি। তাই পয়লা নম্বর প্রশাসকের মাথা থেকে লীগে ওঠানামা বন্ধ রাখার বুদ্ধি বেরোতেই সহযাত্রী সবাই সেই চক্রান্তকে লুফে নিলেন সেবার।

সহযাত্রী অনেক ছিলেন। আজও আছেন প্রশাসনে।

সহযাত্রী তাঁরাই যাঁদেরও লীগে একটি করে নিজস্ব দল আছে। অথচ খেলার মুরোদ নেই। তাঁরা সমব্যথায় ব্যথী। দক্ষতা যখন নেই তখন ছলে, কৌশলে নিজেদের দলকে এমহল-ওমহলে রেখে দিতে হলে লীগে ওঠানামা বন্ধ রাখা ছাড়া তাঁদের আর গত্যন্তর কিই বা!

তাই সেদিন তাঁরা লীগে ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থাকে দৈব দাওয়াই

জ্ঞানে গলাধঃকরণ করেছেন। এবং উত্তরকালে ঈশাণ কোণে সিঁদুরমাখা মেঘের আভাস দেখা দেওয়া মাত্রই সেই মহৌষধ আবার গলায় ঢেলেছেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে কলকাতার ফুটবল লীগে অন্ততঃপক্ষে তিনবার ওঠানামা প্রথা নিয়ামক সংস্থার সংশোধিত বিধানে বন্ধ।

১৯৫২ সালে কলকাতা ফুটবল লীগে ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থায় ফুটবলের কর্ণধারেরা সায় দিয়েছিলেন ফুটবলের প্রশাসক গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় একব্যক্তির মুখ চেয়ে। কিন্তু কালে ব্যক্তির সেই স্বার্থ নিছকই শ্রেণীস্বার্থে পরিণত হয়েছে। জিততে এবং লীগ পেতে নামমাত্র যে কটি দল খেলে তাদের ছাড়া বাকী কটি প্রতিযোগীর স্বার্থ ও প্রয়োজন আজ অভিন্ন। তারা চায় ওপরতলায় থেকে যেতে, যেন-তেন-প্রকারেণ। তাই বাহান্ন সালে ফুটবলের মুখ্য প্রশাসক যে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন সেই নেতৃত্বকেই তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা আজ মনেপ্রাণে মেনে নিচ্ছেন।

কিন্তু তবু বলি, সব অপরাধ একা সেই নেতার নয়। সহগামীদের ভাগও গুরুভার। তাঁরা নিষ্ঠায় ও যত্নে এবং সুস্থমনাদের নিরপেক্ষ সমালোচনা সয়েও লজ্জাহীনের মতই কলকাতার ফুটবলের ওপর বাহান্ন সালে আবিষ্কৃত দাওয়াই প্রয়োগ করে চলেছেন।

হাতুড়ে বদ্যি আবিষ্কৃত এই দাওয়াই মূল্যের নিরিখে সত্যিই কোন ওষুধ নয়। এই দাওয়াইয়ে রোগ সারে না। জ্বর-জ্বালা কমেও না। শুধু আফিমের মত সাময়িক নেশা জাগিয়ে আবার একসময় ঝিমিয়ে পড়ে। এই নেশায় যাঁরা আচ্ছন্ন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে তাঁরা ভাবেন, সমস্যাটা বুঝি সামাল দেওয়া গেল। কিন্তু সত্যিই আফিমের নেশার প্রলেপে জড়িয়েও কোন সমস্যার মূলোচ্ছেদ করা যায় নি। তাই সমস্যা যা ছিল একদিন আজও তাই হয়ে রয়েছে।

এদিকে ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থায় লীগ ফুটবলের কি হাল হতে চলেছে!

লীগে ওঠানামার আশা ও আশঙ্কা থাকবে না। কাজেই কেউ হতমান। আবার কারুর পোয়া বারো! যারা নীচের মহল ছেড়ে ওপরতলায় ওঠার স্বপ্ন দেখছিল তাদের উৎসাহে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। আর যারা না খেলে শুধু পয়েণ্ট ভিক্ষে করে কোনমতে তাদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখছিল তারা এই ব্যবস্থায় হাতের কাছে স্বর্গ পেয়ে গেল!

আয়োজনটি কোন পক্ষকেই ভাল খেলার প্রেরণা দিতে পারবে না। এর পর লীগ প্রতিযোগীরা যদি এগারোজনের বদলে নামমাত্র কজনকে মাঠে নামায় অথবা উঠতি তরুণদের বদলে পঞ্চাশ-ষাট বছরের বৃদ্ধদের ধরে এনে খেলার দিনে মাঠে হাজির করে তাহলেই বা তাদের দোষ দেবে কে?

এক কথায় বলা যায় যে, কলকাতার ফুটবল লীগে প্রতিযোগিতা থাকবে শুধু পুরোবর্তী কটি দলের মধ্যে। অন্যান্য বিভাগীয় প্রতি-যোগীরা জানবে যে লীগ পেলেও ওপরতলায় ওঠার পাশপোর্ট পাওয়া যাবে না। কাজেই তাদের পক্ষে ভাল খেলার প্রেরণা না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই প্রতিযোগিতা বলতে শুধুই বোঝাবে সিনিয়ার বিভাগের নামমাত্র কটি দলের চেষ্টা।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভেবেই ওঠানামা প্রথা রদের সময় চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথার অবলুপ্তি ঘটান হয় নি। নীচের মহলে যারা চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পাবে তারাও ওপরতলায় আসতে পারবে না অথচ আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় কোন কোন পক্ষকে লীগ জয়ীর সম্মান দেওয়া হবে।

এ সম্মানের অনেকখানি যে মেকি অনুধাবন করলেই তা বোঝা যাবে। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে তাদেরও শতকরা নব্বইটি লীগ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়তে হবে না। নামমাত্র এক-আধটি খেলায় জিততে পারলেই হলো।

এই এক-আধটি খেলার পরিপ্রেক্ষিতে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথা চালু

রাখায় বেনিয়া বুদ্ধিরই জয়জয়কার ঘটেছে। ওই এক-আধটি খেলার সূত্রেই ফুটবল মরশুমে চ্যারিটি ম্যাচের আসর বসানো হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ঘরে সেই সুবাদে মোটা টাকা উঠবে এবং সেই টাকা নাড়াচাড়া করতে করতেই ফুটবলের মাতব্বরেরা ফুটবলের জন্যে কিছু করা হয়েছে বলে নিজেদের সার্টিফিকেটে নিজেরাই সান্ত্বনা পেতে চাইবেন।

তবে তাঁরা নিজেদের জন্যে যে দরাজ সার্টিফিকেটই উপুড়হস্ত করুন না কেন খেলাধূলার এবং জাতি গঠনের ইতিহাসে লীগে ওঠানামা বন্ধে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত চিরদিনই ধিক্ৃত হয়ে থাকবে। এই সিদ্ধান্তে লীগ ফুটবলের কাঠামো থেকে প্রতিযোগিতার ছিটে-ফোঁটা মুছে ফেলা হয়েছে। লীগের আভিধানিক সংজ্ঞাকে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সব মিশিয়ে বিশুদ্ধ ভেজাল পরিবেশনের রাস্তাকে নির্বিঘ্ন করে তোলা হয়েছে।

লীগে ওঠানামা থাকবে না, অথচ থাকবে চ্যাম্পিয়ন প্রথা। এমন অভিনব ব্যবস্থারই আর এক নাম সোনার পাথর বাটি! এই অভিনব সম্পদ হাতে নিয়ে বাংলার ফুটবলের মান উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করলেও যে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছবে তা বোধকরি বলে বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু খেলার মান না বাড়লেও তেমন ক্ষতির আশঙ্কা নেই যে ক্ষতির আশঙ্কা জাগাচ্ছে এই ব্যবস্থা মানুষের চরিত্র হননের চক্রান্ত এঁটে।

খেলার মাঠে হালে পানি না পেলেই যদি ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থার ফাঁকে নিজেদের এবং চার-পাঁচ মাসের মেয়াদে ফুটবল মরশুমের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা হয় তাহলে সুস্থ, সবল প্রতিযোগিতা গড়ার মতো শক্ত মানসিকতা গড়ে উঠবে কোন্ সূত্রে? ফাঁকির রাস্তাকেই যদি উজ্জীবনের সড়ক বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে ফুটবল মাঠে যারাই আসবে তাদের বরাতে কুশিক্ষা, অশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই কি জুটবে?

এইটেই সবচেয়ে ভয়ের কথা। আমাদের ফুটবল রসাতলে গেলেও দুর্ভাবনার লাঠি তেমন জোরে জাতির মাথায় পড়বে না যেমন জোরে পড়বে বাড়ন্ত ছেলেরা যদি মাঠ থেকে চরিত্র নষ্টের যতো কিছু কুশিক্ষা আত্মস্থ করে সমাজে ফিরে আসে। তাই বলছিলাম যে কলকাতার লীগ ফুটবলে ওঠানামার ব্যবস্থা বন্ধ রেখে শুধু ক্রীড়াগত মানেরই আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পাকা করে তোলা হয় নি। সেই সঙ্গে কিশোর তরুণদের চরিত্র হননেরও নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের তলা ফুটো করে দেওয়ার উপায় কি ?

উপায় হরেক রকম আছে এবং অনেক পক্ষই সেই কাজে বড় ভূমিকা নিতে পারে। যে কটি পক্ষ সিনিয়ার বিভাগে খেলে লীগ পেতে চায় তারা এই মেকি লীগ প্রকল্পের বিরোধিতা করলেই ওঠানামা বন্ধের চক্রান্ত হার মানতো। কিন্তু তা তারা করে নি। তারা যদি বলে, ভেজাল মেশানো লীগে আমরা খেলবো না তাহলেই কাজ হয়। কিন্তু তা তারা বলতে পারে নি। কেউ বা বলতে চায় নি। নিজেদের স্বার্থচিন্তায় তারাও আজ চতুর সাজবার চেষ্টা করছে। অগুন্তি প্রতিরোধের বদলে নামমাত্র দু-একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যদি চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি !

এই মন্দ ভাবনায় তারাও আজ অনুপ্রাণিত। তারাও ভাবতে চাইছে না যে এ লীগ জয়ের স্বীকৃতির দাম কানাকড়িও নয়। খেলতে যারা প্রস্তুত নয়, সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়তে যারা চায় না (ব্যবস্থাপনাও সে প্রতিযোগিতা গড়ায় প্রেরণা জোগায় না), তাদের হারিয়ে লীগ পাওয়ায় পৌরুষ কতোটুকু ? কিন্তু সেকথা বোঝার মতো মানসিক মূলধনও সম্ভাব্য লীগ বিজয়ীরা আজ হারিয়ে বসেছে। তারা হীরে ফেলে দিয়ে কাঁচের টুকরোকেই মূল্যবান সংগ্রহ বলে মনে করছে। তারা কি সত্যিই পরশপাথরকে চিনতে পারবে ?

তারা আসল বস্তু পেতে চায় না। তাই ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থা যখন পাকা করে তোলা হয় তখন তাদেরই কেউ হাত-পা গুটিয়ে

নিস্পৃহের মতো বসে থাকে। এ নির্বিকার রূপ কিন্তু অর্থহীন নয়। মৌন থেকেও সে পরোক্ষে ব্যবস্থা বদলে সায় দিয়েছে। আর কেউ বা উল্টো-পাল্টা সুরে ফুঁসিয়ে প্রতিবাদের চড়া কণ্ঠ আকাশে তুলেছে। কিন্তু মুখ ফুটে একবারও বলে নি যে, যে লীগের অনেকখানি ভেজাল সে লীগে আমরা খেলবো না।

ওরা কেউই সত্যিকারের খেলোয়াড় নয়। লীগ পেলে কি হবে, আদর্শ শিক্ষার আশীর্বাদে ওরাও সুশিক্ষিত নয়। ইচ্ছে করলে লীগ প্রতিযোগীদের বড় শরিকেরাই ওঠানামা বন্ধের ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারতো। কিন্তু তা তারা করে নি। করতেও চায় নি।

আর যে পক্ষ পারেন ভেজালের পাঁক থেকে কলকাতার ফুটবলকে উদ্ধার করতে সে পক্ষ হলেন ক্রীড়ামোদী দর্শকেরা। আমেরিকান ফ্রি স্টাইল ছাপমারা মিল্ কুস্তির মতো ওঠানামা ব্যবস্থাবর্জিত যে ফুটবল লীগ সাজানো ব্যাপার তার সঙ্গে দর্শকেরা যদি আড়ি পাতাতে পারেন তাহলে শুধু আর্থিক দুর্ভাবনাতেই সংগঠক নিজের চরিত্র শুধরে নিতে এগিয়ে আসে। দর্শকেরা বেঁকে বসলেই ওঠানামা বন্ধের ভূতটি কলকাতার ফুটবলের ঘাড় থেকে নেমে বসতে পথ পায় না।

কিন্তু তা কি হবার জো আছে!

জেনেশুনেও আমরা, দর্শকেরা এই ফুটবল দেখতে মাঠে যাবো। দলের নামের মোহে নাচানাচি করবো। সুস্থ প্রাণকে অসুস্থ পরিবেশে উজাড় করে দিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরবো। আমরাও বোধহয় ভেজালেই পরিতৃপ্ত থাকতে চাই। তাই আমাদের বরাতে ওঠানামা ব্যবস্থাবর্জিত আজগুবী ফুটবল লীগ ছাড়া আর কি-ই বা জুটতে পারে!

আমরা কেবল আক্ষেপে কপালই চাপড়াতে পারি। কিন্তু সমস্বরে সবাই বলতে চাই কি যে এমন ভেজালের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই?

ফুটবল মাঠে পিকেটিং !

ফুটবল মাঠেও সেই ছবি !

পিকেটিং-পোস্টার, উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, মিছিল ! সব মিলিয়ে যেন রাজনৈতিক রণক্ষেত্র।

বিক্ষোভ মিছিলের অন্তর থেকে চিৎকার উঠছে, খেলার নামে তামাশা দেখা বয়কট করুন, মেঠো অনাচার বন্ধ হোক, জনসাধারণের দেওয়া আশী হাজার টাকা তছরূপের জবাব কই ? লীগে ওঠানামা বন্ধ রাখা চলবে না !

এখানেও সেই পরিচিত আর্তনাদ, চলবে না, চলবে না !

কোথায় গেলে আজ এই ধ্বনি শুনতে পাব না ! জীবনের কোন্ নিরালা কোণে ? অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অবশ্যই রাজনীতিক জীবনে এই ধ্বনি সোচ্চার। কৃষ্টির ক্ষেত্রও বাদ পড়ছে না আজকাল। বাকী ছিল বুঝি শুধু এই খেলার মাঠই। কিন্তু মাঠেরও রেহাই নেই। সেখানে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। পিকেটিংয়ে শুরু। পরিণতি কোথায় ? কে জানে !

শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ হয়েছে। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। চাপা উত্তেজনার অস্তিত্ব আজ অনুভব করা যাচ্ছে। আন্দোলনের গলা চাপতে যদি জোর ফলান হয় তাহলে কি মাঠের শান্তি বজায় থাকবে ? যেকালে রাজনীতির চাহিদা সর্বাত্মক সেইকালের অনেক আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, আন্দোলনের প্রাথমিক চেহারা শান্তিপূর্ণ হলেও উস্কানি, অসহিষ্ণুতা, জোর-জুলুম এবং আরও নানান সূত্রে বাস্তব অবস্থার শান্তি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না।

এবারেও যদি তাই ঘটে, তাহলে কি হবে ? ধরপাকড় চলবে ?

পুলিশের লাঠি সবিক্রম আস্ফালন জাগিয়ে জনসাধারণের মাথা ভাঙ্গবে? আনন্দময় ক্রীড়াভূমি কি নির্যাতীত মানুষের চোখের জলে ভাসবে? হায়! এর জন্যেই কি আমরা খেলতে চেয়েছিলাম? অনাবিল আনন্দের উপকরণ কুড়োতেই না আমরা এসেছি ফুটবল মাঠের ধারে!

কেন এমন হল? কেন আজ সারা দেশ এমন করে ফুঁসছে? ভাত-কাপড়, তেল-মাছ, ট্রেনের টাইম—ভারতরক্ষা বিধি এবং আরও কত কি! সবেতেই ফোঁসফোঁসানি। কোথায় সবিক্রম, কোথাও বাঁধাধরা পথে। ক্ষোভ বিক্ষোভ সর্বত্রই রয়েছে। কেন এমন হল? কেউ কি তার অনুসন্ধান করবে না? এই একটি প্রশ্নই আজ মনের কোণে উত্তরের প্রতীক্ষায় মাথা কুটছে। কে উত্তর দেবে?

একদিকে সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার আশ্বাস। সেই আশ্বাস ঘিরে বিরাট কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ। অন্যদিকে জনচিত্ত উৎসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভধ্বনি, চলবে না, চলবে না। এ দুয়ে মিল কোথায়! মিল নেই! আছে অনভিপ্রেত গরমিলে গড়া মস্ত বড় এক ফাঁক। সেই ফাঁক পূরণ করতে হলে সবার আগে দরকার আত্মানুসন্ধানের। তা না করে গালভরা প্রতিশ্রুতির লোভ দেখিয়ে অথবা অপশাসনের চণ্ডনীতির রথ ছুটিয়ে সত্যিকারের লক্ষ্যে কি পৌঁছান যাবে?

চলবে না, এই ধ্বনি কলকাতার ফুটবল মাঠে আজ অনেক কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে কেন তার কারণ হয়ত ফুটবলের প্রশাসকদের অজানা। কিন্তু সে কারণ আমরা জানি।

প্রশাসনের নামে অপশাসনের ঢালাও প্রশ্রয়ে ক্রীড়ামোদীদের মনে দীর্ঘদিন ধরে অনেক ক্ষোভ জমেছে। যে সংস্থার ওপর ফুটবলের তদারকীর ভার সেই সংস্থার একপেশে আচরণবিধি, জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় এবং গোষ্ঠীভুক্ত একদলের স্বার্থ

রক্ষায় নানান চক্রান্ত লক্ষ্য করে সুস্থ মানুষের মন বিষিয়ে উঠেছে। তিন বছরের জন্যে লীগে ওঠা-নামা বন্ধের সিদ্ধান্ত আজ বিষিয়ে ওঠা মনকে ফেটে পড়তে উস্কানি যুগিয়েছে। তাই একদল মানুষ আজ বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। আন্দোলনকারীরা উপলক্ষ্য। নাটের গুরু ফুটবলের অনাচার।

আন্দোলনকারীরা বলছেন, যে লীগে ওঠা-নামার ব্যবস্থা নেই সেই লীগ খাঁটি প্রতিযোগিতা নয়। মেকী। ভেজাল মেশানো। ওঠা-নামা নেই। কাজেই হারজিতেরও মূল্য নেই। এই খেলা খেলে কি হবে? দেখেই বা কোন্ সান্ত্বনা লাভ করা যাবে!

কথাটা অযৌক্তিক নয়। যে ফুটবলে হারজিতের দাম কানা-কড়িও নয়, সেই ফুটবল খেলে বাড়ন্ত ছেলেরা কোন্ শিক্ষালাভ করবে? জীবনের সৎ শিক্ষা পেতে তাদের মাঠে ডাকা হয়েছে। অথচ মাঠ থেকে তারা যদি শুধু ফাঁকির মন্ত্রটিই মুখস্থ করে নিয়ে যায় তাহলে একদিকে যেমন তাদের চরিত্র গঠনের আয়োজনের তলা ফুটো হয়ে যাবে, অন্যদিকে তেমনি জাতির ভবিষ্যতও নির্বিঘ্ন, নিরাপদ থাকতে পারবে না। কারণ, আজকের বাড়ন্ত ছেলেরাই তো একদিন সমাজ ও জীবনের হাল ধরবে।

খেলার মাঠ জাতির শিক্ষাভূমি।

কথাটা অন্য দেশ মানে এবং সেই শিক্ষাভূমিকে সুন্দর করে সাজাতে তাঁরা আন্তরিকতা দেখান। কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল! আমাদের ফুটবলের প্রশাসনিক কার্যকলাপ মাঠে সৎ শিক্ষা দেবার বদলে চরিত্র হননের পাকা আয়োজন ঘটিয়েছে। এই ব্যবস্থা ছেলেদের লীগে পয়েন্ট ছাড়তে এবং হার-জিতের কদর্থ উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। এই ব্যবস্থার আওতায় যারা আসছে তাদেরই চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এমন অদ্ভুত লীগে খেলে আমরা লাভবান হচ্ছি না। হচ্ছি ক্ষতিগ্রস্ত। পড়ছি ফাঁকিতে। ফাঁক-ফাঁকির গোপন ও খোলা সড়কগুলিকে যে ব্যবস্থা

অতি যত্নে সাজিয়ে রেখেছে সেই ব্যবস্থাকেই আজ ধিক্কার জানাচ্ছে ওঠা-নামা প্রথা রদের বিলুপ্তির এবং খেলার নামে ছেলেখেলা বয়কটের দাবী। অন্য কোন দেশের ফুটবল মাঠে এমন অস্বাভাবিক আন্দোলন কখনও হয়েছে বলে শুনি নি। হবে কি করেই বা! কোন দেশ কি কোনদিন লীগে ওঠা-নামা বন্ধের ফন্দি এঁটেছে?

খেলতে যারা ভয় পায়, হারতে যারা শিউরে ওঠে, ন্যায়যুদ্ধে কোন আশা নেই জেনে যারা কুচক্রের অলিগলিতে ফেরে, ওঠা-নামা ব্যবস্থা বর্জিত লীগ ফুটবল তাদেরই পরিকল্পনা। তাদের যুক্তি, প্রতিটি খেলার মেয়াদ বেড়েছে। অনেক প্রতিযোগীর অসুবিধে হতে পারে ভেবেই লীগে ওঠা-নামা বন্ধ রাখা হল। যুক্তিটি কাজীর, সন্দেহ কি!

অসুবিধের প্রশ্নই যদি বিচার্য হয় তাহলে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হল কেন? চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার জন্যে যারা চেষ্টা করবে বর্ধিত মেয়াদে খেলার জন্যে তাদের কি অসুবিধে সইতে হবে না? হবে বৈকি। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের ঠাট্ বজায় না রাখতে পারলে যে জনসাধারণের দেওয়া অর্থ ঘরে তোলা যায় না! কাজেই চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা অটুট রেখে দিয়ে ওঠা-নামা প্রথাটিকে কোতল করে দেওয়া হয়েছে।

কদিন আগে ওঠা-নামা বন্ধের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে কলকাতার ফুটবলের এক প্রশাসনিক কর্তা বলছিলেন যে, বিভিন্ন লীগে যে সব দল খেলে তারা প্রায় সবাই-ই ওঠা-নামা প্রথা রদের সমর্থন করেছে। (করবেই তো! কুশিক্ষার চাহিদা তো এমনি সর্বগ্রাসী!) কাজেই গণতান্ত্রিক রায় মেনে ওঠা-নামা প্রথা রদ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? শুনুন কথা! গণতন্ত্রের দোহাই! একেই বলে ভূতের মুখে রাম নাম!

না, এই গণতন্ত্রে আমাদের কাজ নেই। এই গণতন্ত্রে যেমন

ফুটবলের মঙ্গল হবে না, তেমনি হবে না সমাজের কোন কল্যাণ। গণতন্ত্রের বনেদ হল সার্বিক কল্যাণবোধ। যে গণতন্ত্র সার্বিক কল্যাণবোধ থেকে উৎসারিত নয় তা কি আশীর্বাদ, না অভিশাপ? একথা যাঁরা বুঝতে চান না তাঁদের চরিত্র সংশোধন করাও কারুর কর্ম নয়।

যে চরিত্রের প্রভাব সমকালীন সমাজকে শিক্ষা দিতে পারে সে চরিত্র কলকাতার ময়দানে কোথায়? সেখানে ফুটবল ঘিরে যত না অনুরাগের প্রকাশ তার চেয়ে দলকে কেন্দ্র করে দাপাদাপি বেশী। সমর্থিত দলের জিতই কাম্য। তাই নিয়েই যতো চেঁচামেচি। হৈ-হট্টগোলে সুস্থ জীবনের অসুস্থ অভিব্যক্তি। আসল খেলা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আদর্শ যেন জলের দাগ। কবে তা মন থেকে মুছে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু অশোভন উত্তেজনা আর অসুস্থ চিন্তা।

এই অশোভন উত্তেজনা এবং এই অসুস্থ চিন্তা আমাদের বৈতরণী পারের কড়ি জোগাতে পারবে না। উজ্জীবনের পথ নির্দেশ দেবেও না। শুধু পারবে বাড়ন্ত ছেলেদের কুশিক্ষায় রপ্ত করে তুলতে। এই ব্যবস্থা থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। এই ফুটবল খেলার চেয়ে না খেলাই মঙ্গল। তবুও খেলা হচ্ছে। হবেও। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

এই বিচিত্র দেশের বিচিত্রতর কাণ্ডকারখানা রুখতে আজ গুটিকয়েক সুস্থমনা মানুষ যে ঝাণ্ডা উচিয়ে মাঠের ধারে এগিয়ে এসেছেন, এইটিই একমাত্র আশার কথা। এক গভীর চক্রান্তে জড়ান অতি কদর্য বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সকল পক্ষকে সচেতন করার কাজ তাঁরা যে স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, সমাজে এখনও মানুষ আছেন। সুস্থ চিন্তার মূলোচ্ছেদ আজও হয় নি। তাঁরা হারবেন কি জিতবেন জানি না, কিন্তু একথা জানি যে, ওঁদের চিন্তা ও কর্মোদ্যমে বহু

যুগের জঞ্জাল পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির যথার্থ মূল্যায়নে আমাদের যেন ভুল না হয়।

ওঁরা ফুটবল মাঠে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। ওঁদের দাবী, হারজিতের মূল্য ধরে দেওয়া হোক, পাশ-ফেলের হিসাব-নিকাশ করা হোক। পড়ুয়া ছেলেদের যেমন বলা হয়, এগোতে চাও তো পড়ায় মন বসাও নইলে প্রমোশন পাবে না। অবিকল সে কথাই বলা হোক খেলোয়াড়দের। সেই কথাই সুস্থ পথের দিশারী। সৎ শিক্ষার প্রেরণা এবং সে শিক্ষা শুধু মাঠেরই নয়, জীবনেরও।

এই দাবী সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। যাঁরা কলকাতার ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামোর হাল ধরে আছেন এবং তাঁদের মদত জোগাবার জন্যে যে কটি অক্ষম ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে তারা হয়ত এই দাবী আজ কানে তুলবেন না। কিন্তু চিহ্নিত ওই কজনের জোটবাঁধা সুখী পরিবারের বাইরে রয়েছেন যাঁরা, তাঁরা যদি কোনদিন সমস্বরে সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত দাবী মানার হাঁক তোলেন বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তায় তাহলেই মুসকিল আসান হয়।

সেই দিনটি কবে আসবে? কবে সুখী পরিবারের বাইরের সব কটি মানুষ এক উচ্চারণে বলবেন, নকল প্রতিযোগিতা আর ভূয়ো মর্যাদা ঘিরে যে লীগের আয়োজন তা আমরা দেখব না? আজকের আন্দোলন কি সেই অনাগত ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে?

সংগঠনের দুই চিত্র

খবরগুলো বিলিতী। তবু এই খবরে আমাদের স্বদেশী ক্রীড়া-মহলের শিক্ষণীয় কিছু আছে।

খবর মূলতঃ দুটি। একটিতে প্রকাশ, ফুটবল মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনার মূলোচ্ছেদের চেষ্টায় ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন একটি নামকরা ক্লাবকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। অপরটিতে জানা গিয়েছে যে খেলার ফলাফল আগে থেকেই গড়াপেটা করে রাখার অপরাধে জনকয়েক খেলোয়াড়ের কারাদণ্ড ঘটেছে।

অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে বিখ্যাত বৃটিশ ফুটবল দল এভারটন। বৃটিশ ফুটবল ইতিহাসে এভারটনের ভূমিকা আমাদের বড় বড় দলগুলির চেয়ে ছোট নয়। এভারটনের নিজস্ব মাঠ, নিজস্ব স্টেডিয়াম আছে। আছে নানান কীর্তি। আর আছে অসংখ্য সদস্য এবং ততোধিক সমর্থক। আর সেই সদস্য ও সমর্থকদের নিয়েই যতো ঝামেলা।

খেলা যদি তাঁদের পছন্দমাফিক না হয় অমনি সদস্য-সমর্থকদের মাথায় খুন চড়ে যায়। জানা অজানা যতো রকমের বেয়াদপি থাকতে পারে তারই আশ্রয় নিয়ে এই অনুরাগীরা মেঠো কাজকর্মে তুলকালাম বাধিয়ে তোলেন। এবং এ ব্যাপারে সমর্থকদের ভূমিকাই অপেক্ষাকৃত বড়।

সমর্থক আর সদস্যদের সংযত করে রাখার জন্যে ফুটবল এসোসিয়েশন অতীতে বারে বারে এভারটনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয় নি তাতে। অগত্যা চরম পথ অবলম্বন করে এসোসিয়েশন এবার এভারটনকে আড়াইশ পাউণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডিত এবং এভারটনের নামী খেলোয়াড় স্যাণ্ডি ব্রাউনকে দু সপ্তাহের জন্যে সাসপেণ্ড করেছেন।

ব্রাউনের অপরাধ, খেলার সময় মাঠের মধ্যে তিনি বেপরোয়া মূর্তি ধরেছিলেন এবং হাবভাবে রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে সমর্থকদের উস্কে দিতে কসুর করেন নি। এফ এর আশা, এই অর্থদণ্ড ও সাসপেনশনের পর হয়তো এভারটন ক্লাবের সম্বিৎ ফিরে আসবে।

এ ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলম্বন করা হয় না কেন?

আমাদের ফুটবল মাঠেও এভারটনের উগ্র অশালীন ভূমিকার অস্তিত্ব আছে এবং সমর্থকদের উস্কে দেবার জন্যে তেমন তেমন খেলোয়াড়েরাও মাঝ মাঠে তৈরী রয়েছেন। নাম করতে চাই না। তবু তাঁরা যে কারা সে কথা জানতে কারুর বাকী নেই।

সমর্থকেরা তো রেফারীর বা বিপক্ষ দলের মুণ্ডপাত করতে সব সময়েই কোমর বেঁধে আছেনই। ক্লাব-সদস্যরাও পিছিয়ে থাকেন, একথা বল্লে সত্যের মর্যাদা রাখা হয় না।

বড় বড় ক্লাবের অনেক সদস্যকে কলকাতার ফুঠবল মাঠে উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ড বাধাতে দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। এমনিতে তাঁরা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরেন। মাঠের সাদা গ্যালারির বিশিষ্ট আসন জুড়ে বসেন। কিন্তু যেই রেফারীর আচরণে পান থেকে চুন খসলো বা সমর্থিত দল খুব সহজে তার লক্ষ্যে এগোতে পারলো না, অমনি তাঁদের ভদ্রয়ানার মুখোস খসে ভেতরের মানুষটিকে বাইরে টেনে আনে।

ভেতরের আদি জীবটিই হলো সভ্যতার ও সমাজের শত্রু। এই শত্রু নিধনে অথবা তাদের প্রতিহত করার সঙ্কল্পেই বৃটেনের ফুটবল এসোসিয়েশন অপরাধী ক্লাবের দণ্ডভোগের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা ফুটবলে প্রথম পাঠ ও উচ্চতর শিক্ষা ইংরেজের কাছ থেকে নিয়েছি এবং আরও নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। কিন্তু সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় ইংরেজের যে শিক্ষা কার্যকর ও মুসকিল-আসানের পথ সে শিক্ষাকে শিরোধার্য মানতে পারি নি।

মানতে পারি নি, মানতেও চাইও না। সে শিক্ষা মানতে গেলে বড় বড় পক্ষদের গায়ে হাত পড়ে যায়। কলকাতার ফুটবলের মাথা বলে যাঁদের প্রসিদ্ধি দূরবিস্তৃত তাঁদের সুনামের পুঁজিতে টান পড়ে এবং সেই টানেই তথাকথিত বড় পক্ষদের ভেতরের চেহারাটা ফাঁস হয়ে যায়।

আসলে আমাদের ফুটবলের ব্যবস্থাপনা বড় বড় পক্ষদের গা বাঁচাতেই তৎপর। আর ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপনায় বড় ছোটর বাদবিচার নেই। অপরাধের মূল্যায়নে সে দেশে বড়রা যা ছোটরাও তাই। অপরাধীদের শ্রেণী, গোত্র, কিছুই স্বতন্ত্র নয়।

মনে আছে যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে সমর্থক ও সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করতে এফ এর নির্দেশে বিখ্যাত আর্সেনালের সদস্য-আসন ফাঁকা রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। সেদিনে আর্সেনাল খেলতো যখন, দল সদস্য ও সমর্থক তখন কোনো পক্ষই সে খেলা দেখার অধিকার পেতো না। রীতিমতো কঠিন শাস্তি। তাতে কাজ হয়েছিল। সেই থেকে আর্সেনালের উগ্র সদস্য ও সমর্থক, কেউ আর ফুটবল মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নিতে সাহস পান নি।

এসব দৃষ্টান্ত শিক্ষণীয়। বেয়াদপ দর্শকেরা অং[illegible] ফুটবল মাঠে যে ঝামেলা জড়ো করছেন তা থেকে মাঠকে মুক্তি দিতে হলে বৃটিশ ফুটবল এসোসিয়েশন যে পথে পা মেলেছে সেই পথ পরিক্রমণ ছাড়া অন্য উপায় নেই। শুধু দর্শকের দাপাদাপিকে মুখের কথায় রোখবার চেষ্টা করা হলে কাজের কাজ করে তোলা যাবে না।

এবার দ্বিতীয় নজীরটির কথায় আসা যাক।

দ্বিতীয় নজীর আরও ভয়ংকর। নেপথ্যে পয়সা কামাবার চক্রান্তে জনকয়েক খেলোয়াড় আগে থেকেই খেলার ফলাফল গড়েপিঠে রাখতেন। জানতে পেরে এফ এ এক অনুসন্ধান কমিটি বসালেন এবং সেই তদন্তের সূত্রে বিষয়টিকে আদালতে পাঠান মাত্র আদালতের রায়ে অপরাধীদেরও কারাবাস ও অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কমপক্ষে দশজন খেলোয়াড়কে আদালত অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের দলে জনকয়েক সত্যিকারের নামী খেলোয়াড়ও আছেন। যথা ইয়র্ক সিটির প্রাক্তন অধিনায়ক জন ফাউণ্টেনের, মানসফিল্ড টাউনের প্রাক্তন দলনায়ক ব্রায়ান ফিলিপসের ও স্যামুয়েল চ্যাপম্যানের, স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় দলের প্রিচার্ড বিট্‌ল, ইংলণ্ড ও এভারটনের টনি কে, ইংলণ্ড ও শেফিল্ড ওয়েডনেসডের পিটার সোয়ান প্রমুখের নামোল্লেখ করা যায়।

এঁদের কাজই ছিল পারস্পরিক সমঝোতার সূত্রে খেলার ফলাফল আগেই গড়ে রেখে জুয়ার মাধ্যমে না খেটে মোটা টাকা কামিয়ে নেওয়া। পালের গোদা হলেন এভারটনের প্রাক্তন ও অবসৃত খেলোয়াড় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক জেমস গল্ড। গল্ড ১৯৬০ সাল থেকে এই চক্রান্তে অর্থ উপার্জন করে আসছিলেন। এবারেই প্রথম জানাজানি হয়ে পড়ায় অর্থের বদলে তাঁর জন্যে চার বছর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে।

খেলার নামে এই যে জুয়াচুরি ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন তা নির্মূল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কি করছি?

আমাদের দেশে পেশাদারী ফুটবলের ব্যবস্থা নেই বলে বাজি ধরে টাকা পয়সা এ-হাত ও-হাত করার রেওয়াজ নেই। কিন্তু ভিন্নতর স্বার্থে আগে থেকেই খেলার ফলাফল গড়ে রাখার চক্রান্তটি জিইয়ে রাখার কথা অশ্রুত নেই।

ইংলণ্ড ফুটবলে দুর্নীতি দমনে আদর্শ ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর আমরা কি করছি তা চিন্তা করা দরকার।

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন যা করতে পেরেছেন আমরা তা করতে পারি না কেন?

দক্ষতার বিকল্প নেই

আসুন, আবার ফিরি মাঝমাঠে। এবার আর ঘরোয়া খেলা নয়। আন্তর্জাতিক আসর।

টোকিও ওলিম্পিকের আগে এশীয় অঞ্চলের প্রতিযোগীদের ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ চলছে। সামর্থ যার আছে বাছাই পর্বের বাধা ডিঙ্গিয়ে সেই পারবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।

সেই সামর্থ ভারতের আছে কি? প্রশ্নটির জট ছাড়াতে ফিরে যেতে হয় দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরস্থ সি আই টি স্টেডিয়ামে। যেখানে ভারত আর ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘিরে ফুটবলের আন্তর্জাতিক আসর পাতা।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেলা চলার পর বিরতির সঙ্কেত। তখন ফলাফল সমান সমান। ভারত প্রথম গোল করেছে। ইরাণ করেছে পরিশোধ।

পাঁচ মিনিটের বিরতি। খেলোয়াড়েরা বিশ্রাম নি..., পোশাক বদলাতে সাজঘরে চলে গিয়েছেন। দর্শকরাও স্টেডিয়ামের প্রশস্ত আসনে সাময়িকভাবে গা এলিয়ে দিয়েছেন। অবসর সকলেরই, শুধু বেতার ভাষ্যকারদের ছাড়া।

তাঁরা তখনো বকে চলেছেন। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে খেলা কেমন হলো, বিশেষভাবে ভারত কেমন খেললো, তারই হিসাব নিকাশের চেষ্টা।

বকবকানির সারতত্ত্ব, মন্দ নয়। জেতার আশায়, তেহরাণের ব্যবধান মুছে ফেলার দুর্জয় সংকল্পে কোমর কষে বেঁধেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। তাঁদের চেষ্টা আছে, সকলের দক্ষতা থাক বা নাই থাক। সেই চেষ্টারই কল্যাণে ইরাণকে ভারত ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতার

মুখে ঠেলে দিয়েছে। সময় সময় প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যের চাপে অস্থিরও করে তুলেছে।

ভারতের খেলায় সুচিন্তিত ছক অনুসরণে নিষ্ঠা রয়েছে। দুজন আক্রমণাত্মক ফরোয়ার্ড এবং পিছিয়ে থাকা সেণ্টার ফরোয়ার্ডটিকে ঘিরে গড়া সেই ছক। ভারতীয়েরা গোল লক্ষ্য করে কড়া সটও করেছেন।

ইরাণীয় গোলরক্ষক বারকয়েক পড়িমরি করে সেই সট রুখে দিলেন। বারদুয়েক পারেনও নি, বল পোষ্টে লেগে ফিরেছে। পাঁচ ইঞ্চির গোলপোষ্ট যে এতোবড় বাধার সৃষ্টি করবে, আগে তা কে জানতো!

তেমন তেমন সটের আজকাল বড়ই দুর্ভিক্ষ! কলকাতার মাঠে সেই সট কালেভদ্রে দেখা যায়। তাই সট দেখে ভাষ্যকারের গদগদ কণ্ঠ সোচ্চার,

ইরাণীয়রা আর যাই করুন এমন জোরালো সট এখনও মারতে পারেন নি।

হায়! কি কুক্ষণেই কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন ওঁরা। দ্বিতীয় পর্বের সুরুতে ইরাণীয় উইং-হাফ লতিফি গজ পাঁচেক এগিয়েই একটি গড়ানে কিক্ করলেন।

আহা! কি সট! মাঠ যেন কেঁপে উঠলো। প্রায় চল্লিশ গজ দূর থেকে তেড়ে আসা সেই সট আর একটু হলেই থঙ্গরাজকে ঠকিয়ে দিয়েছিল আর কি!

ইরাণীয়রা নাকি তেমন সট মারতে পারেন না! বেতার ভাষ্যকারের মন্তব্য কি ওঁরা শুনতে পেয়েছেন নাকি! শুনেই বোধহয় জোরালো সটের ব্যঙ্গোক্তিটি প্রকাশ্যে ছুঁড়ে মারলেন। আরও কতো রকমের ঠাট্টা যে ওঁরা করলেন!

দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে লাগলেন ওঁরা। বল পায়ে নাচাতে লাগলেন ভারতীয়দের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছেন আর

বল পায়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছেন। কখনো আবার সুযোগ এসেছে জেনে শিকারী বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে গোলও করে যাচ্ছেন। ওঁদের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়া ভারতীয়দের দুঃসাধ্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁরাও বুঝি তখন খেলা দেখছেন।

দেখতে দেখতে মাঠের চেহারা গেল পালটে। প্রথম পর্বে ইরাণ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ছেড়ে ছড়িয়ে দিলে। তখন মাঠে শুধু ইরাণ আর ইরাণীয় খেলোয়াড়েরা। তাঁদের দাপটের সামনে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু সঙ্কুচিতই নয়, অস্তিত্বশূন্য প্রায়।

বেতার ব্যাখ্যাতার কণ্ঠস্বরও তখন খাদে নেমে এসেছে। এক-পেশে খেলায় চমক নেই, তাই তাঁর কণ্ঠেও গমকেরও ঘাটতি। ভারতীয় খেলোয়াড়দেরই মতো তিনিও যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।

'খেলা ফুরোতে এখনও অনেক বাকী কিন্তু এরিমধ্যে ভারতীয় দল যেন পরাজয়কে মেনে নিয়েছে। এই পরাজিতের মনোভাব কিন্তু মুসকিল আসানের পথ নয়।'

নয় তো বটেই। মুসকিল আসান হতে পারে না। হয়ও নি। বরং যা ঘটেছে তা আরও শোচনীয়। ভারতীয় ফুটবল যেন ওই লগ্নে আত্মবিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আলো সায়াহ্নের ঘনায়মান অন্ধকারে মিশে যেতেই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল!' সব হারাবার বেদনা সেদিন অনেকে বোধহয় সহ্য করতে পারেন নি। তাই আসর ভাঙ্গার অনেক আগেই তাঁরা আসর ছেড়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন!

কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেই কি আমাদের ফুটবলের কপাল জুড়বে? নিঃসাড়ে সরে পড়ার চেয়ে আজ বোধহয় সোচ্চারে সত্যি কথা শুনিয়ে দেওয়াই দরকার। যে প্রয়োজনের তাগিদে সেই আদ্যিকালে ১৮৮২ সালে ওভালের ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ডের ক্রীড়ানুরাগীরা বলে উঠেছিলেন যে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরেছে। শব বিলীন হয়েছে

ভস্মে। এই ভস্মরাশি অস্ট্রেলীয় দল বহন করে নিয়ে যাবে। সেই তাগিদ আজ আমাদেরও সামনে।

তাই, তেমনি করে, তেমনি তীক্ষ্ণ শানিত কণ্ঠেই আজ বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামে ভারতীয় ফুটবল সমাধিস্থ হয়েছে!

তবেই যদি সম্বিৎ ফিরে আসে। আরও প্রয়োজন এই কারণে যে ভারতীয় ফুটবলের এই হাল দেখেও আজ কলকাতার কোনো কোনো দর্শক এখনও কালনেমীর মতোই লঙ্কা ভাগে ব্যস্ত।

তাঁরা ভালবাসার ধন সমর্থিত দলের খেলোয়াড়দের ঢাকতে চাইছেন। দেশের স্বার্থ চুলোয় গেল, তাঁদের কাছে বড় হয়ে রইলো দল আর দলের খেলোয়াড়েরা।

তাঁদেরি একজনের মন্তব্য ঃ

'চুণী কি করবেন? তাঁর ওপর যে বড্ড কড়া নজর দেওয়া হয়েছিল।'

আর একজনের মন্তব্যও এমনি করুণ,

'বেচারী সমাজপতি। দৌড়ে ওঁদের এঁটে উঠতে পারেন নি।'

অর্থাৎ ইরাণীয় নজরটি যেন একা চুণী গোস্বামীর ওপরই ফাঁস হয়ে এঁটে বসেছিল। আর অন্য ভারতীয়েরা ছিলেন অরক্ষিত! তা ওই ক্রীড়ারসিক ভদ্রলোক খেলার আগে ইরাণীয়দের দোরে ধর্ণা দিয়ে এই মিনতি রাখলেন না কেন যে, আমাদের চুণীকে আপনারা দয়া করে ছেড়ে রাখবেন। তাহলেই উনি খেলতে পারবেন। নইলে নয়।

আর পাশের ভদ্রলোকটিকেও জিগ্যেস করতে সাধ জাগে যে ইরাণীয় গতিবেগ কি তাঁদের ক্রীড়াগত মূলধন নয়? গতি বিসর্জন দিয়ে আন্তর্জাতিক খেলার মাঠে নামলে কি দলগত ক্রীড়ারীতির ইতি করে দেওয়া হয় না? উনিই বা ইরাণীয় খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে বললেন না কেন, দোহাই আপনাদের। অমন জোরে

দৌড়বেন না। আমাদের সমাজপতি এঁটে উঠতে পারবেন না যে!

আশ্চর্য্য! জাতীয় দল ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর ওঁরা আমাদের সমাজপতি আর আমাদের চুণী বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন! এখনও নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা! কালনেমী কখন যেন লঙ্কা ভাগ করতে চেয়েছিল?

এতো দুঃখেও ওঁদের দিকে তাকিয়ে করুণা জাগে। হাসি পায়। হেসে হেসে ওদের দুজনকে এবং ওদের পেছনে পক্ষধারী আরও যাঁরা রয়েছেন তাঁদেরও বলতে ইচ্ছে করে,

এমনি করেই আপনারা সমবেত কণ্ঠে ঐকতান তুলুন। আপনাদের খেলোয়াড়দের দোষ ঢাকুন। দল নিয়ে মাতামাতি করুন। দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে চোখে হলদে কাঁচের চশমা আঁটুন। বুঁদ হয়ে থাকুন, তিলকে তাল বানান। তাহলেই আপনাদের দৌলতে জাতীয় ফুটবলের মান তড়াক করে গাছের মগডালে গিয়ে চড়ে বসবে!

কিন্তু থাক্ ওঁদের কথা। এবার আমার উপলব্ধির উল্লেখ রাখি।

প্রাক্ অলিম্পিক বাছাই পর্বে ভারত ইরানের প্রতি খেলার স্মৃতি আমার কাছে আনন্দদায়ক নয়! বিস্বাদে ভরা। সারা ভারতের ফুটবলের প্রতিশ্রুতিকে ওই মুহূর্তে মনোরম ক্রীড়াভূমি রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামের প্রশস্ত আঙিনায় হাত পা ছড়িয়ে অসহায়ের মতো কাঁদতে দেখেছি। সেই সঙ্গে নিজেও অস্থির হয়েছি বোবা কান্নায়।

যা দেখলাম তাই যদি ভারতের একমাত্র ভরসা হয়, আগামী দিনের সম্ভাবনার মৌল পরিচয় হয়, তাহলে আমাদের কপালে আরও আপশোষ তোলা রইলো এবং আন্তর্জাতিক আসরে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করার রঙিন স্বপ্নও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, সন্দেহ নেই।

পুরো দেড় ঘণ্টারই স্মৃতি অশ্রুসজল তা আমি বলি না। বললে অপরাধ বাড়বে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রতি অবিচার করা হবে। বরং বলি, যা পাইনি তা যেমন সত্যি, তেমনি যা পেয়েছি তাও খাঁটি। দুয়ের মধ্যে ওজনের হেরফের ছিল অবশ্যই। তাই ভারসাম্য রক্ষা করা যায় নি। জিততে জিততে ভারত হেরেছে শোচনীয়ভাবে। ওই হারজিতেই খেলার কৌলীন্য যাচাই হয় বলেই শেষপর্য্যন্ত সামগ্রিক হিসেবে ভারতীয় ফুটবল জাতে উঠতে পারে নি।

জাত ছিল প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তখন ভারতের ছক অনুসারী ক্রীড়ারীতির মেজাজ চড়া পর্দায় বাঁধা। পরিশ্রমে মন রয়েছে। অবিচল সংকল্প অক্ষুণ্ণ। জিততে হবে, তেহরাণের ব্যবধান মুছে ফেলতে হবে। কঠিন কাজ, কঠিনতর পরীক্ষা। তবু সাফল্যের সন্ধানে নির্দেশিত প্রথা প্রকরণ নিয়ে ভারতীয়েরা মাতামাতি করছেন। গোলে সট করেছেন। ইরাণের রক্ষণব্যূহের পুঁজিতে টান মেরেছেন। আগুয়ান দুজন ফরোয়ার্ডকে ঘিরে ক্ষুরধার আক্রমণ শানিয়েছেন প্রতিনিয়তই।

তখনও কিন্তু ভারতীয় ফরোয়ার্ডদের সকলে নির্দিষ্ট কাজটুকু সারা করতে পারছিলেন না। পিছিয়ে পড়েছিলেন জন তিনেক। তবুও এই ঘাটতি পুষিয়ে দেবার জন্যে বৃষস্কন্ধদের আবির্ভাব অদৃশ্য ছিল না। তাই এই মুহূর্তে খেলায় ভারতের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তারপর যেই বিরতি, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতারও ইতি।

হারিয়ে গেল আগের মুহূর্তের আক্রমণাত্মক মেজাজ, ছক বাঁধা প্রকরণ নিষ্ক্রিয়তার অবক্ষয়কেই তখন মেনে নিতে ব্যস্ত। আগের পথ পাল্‌টে গেল, বদলে গেল মতটাও। আমাদের কান্নাও সুরু হলো সেই মুহূর্তেই।

প্রথম পর্বেও অনেক ভারতীয় ঠিকমতো বল ধরতে ও ছাড়তে পারেন নি। পাশিং ও রিসিভিংয়ে ত্রুটি ঘটছিল। সময় সময়

গতিবেগেও ইরাণীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন নি। তবুও ফাঁকে বল গড়িয়ে দিয়ে যে সুস্থ চিন্তাকে ধরে রেখেছিলেন সে চিন্তাও ক্রমশঃ মুঠোর বাইরে চলে যেতে লাগলো। যেতে যেতে একেবারে নিঃশেষিত। তারপর ইরাণীয়রা যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে খেলার নামে ছেলে খেলা করেছেন তখন ভারতীয় ফুটবলের অস্তিত্বই উপহসিত হয়েছে।

কেন এমন হলো ?

হলো ভারতীয়দের দক্ষতার দৈন্যে। তাঁদের দৈহিক সামর্থ যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না প্রকরণগত বিদ্যা অধিগত। ক্রীড়ারীতির ছক কিছুক্ষণ ছিল, কিন্তু বাহ্যিক ছকই তো বিদ্যা নয়। দক্ষতার মৌল পরিচয়ও নয়।

খেলায় হার আছে, জিতও আছে। সুস্থ মূল্যবোধে এ দুটির কোনোটাই আমার কাছে অমূল্য নয়। কিন্তু না খেলে জাতীয় দলের খেলোয়াড়েরা যদি আধখানা সময় সাজানো মাঠে ফুলদানীর ফুলের মতো শুধু সেজেগুজে দাঁড়িয়েই থাকেন তা কি বলতে ইচ্ছে করে ?

এই সাজগোজ সার ফুলেরাই জতীয় ফুটবলের অঙ্গে ও মর্মে আজ শেল বিঁধিয়েছেন। তাঁরা তাকে নিঃস্ব করে ছেড়েছেন। জাতীয় ফুটবলের জীবন যন্ত্রণার উৎস এইখানেই।

ইরাণ কলকাতায় ভারতকে আবার শোচনীয়ভাবে হারাতে পেরেছে শুধু দৈহিক সামর্থ্যের পুঁজির জোরে নয়। হারিয়েছে ক্রীড়াগত দক্ষতার পরিণত মূলধনেই। পরিভাষায় যাকে বলে 'বেসিক স্কিল', তা ইরাণীয়দের অবশ্যই বেশী ছিল।

ভারতীয়দের ক্ষেত্রে দেহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরতির পর। কিন্তু তার আগে দেহগত সামর্থ্যে যখন টান পড়ে নি তখনও ছিল তাঁদের দক্ষতায় ঘাটতি। তখন আক্রমণাত্মক ক্রীড়া পরিকল্পনা অটুট ছিল মনে, কিন্তু দক্ষতার অভাবে প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি।

তখনও ভারতীয়েরা চোখের পলকে বল আয়ত্তে আনতে হিমসিম খেয়েছেন। সতীর্থদের বল পাশ করতে গিয়ে নিজের সম্পত্তি পরকে বিলিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।

তখনো কেউ কেউ বলের পথ চেয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গুনে গুনেই ফুরিয়ে গিয়েছেন। আর ওদিকে ইরাণীয়রা নড়েছেন, সরেছেন। সর্বক্ষণ ছোটাছুটি করে নিজেদের চলমান অস্তিত্বে বলকে আকর্ষণ করেছেন। ওঁরা বলের জন্যে অপেক্ষা করেন নি, বল ওঁদের পায়েই আত্মসমর্পণ করে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে।

ইরাণীয় দলের প্রাথমিক খেলার ছক ছিল মূলতঃ রক্ষণাত্মক। কিন্তু যেই ওঁরা বিপক্ষের সংক্ষিপ্ত সাধ্যের সন্ধান জেনে নিলেন অমনি রক্ষণে আক্রমণে সংমিশ্রণ ঘটলো। দলীয় ক্রীড়ারীতি হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ। ইরাণীয় প্রকল্প ভারতীয়দের মতো শুধু মনের সাধেই জিইয়ে থাকতে চাই নি, দেহগত সামর্থ্য ও ক্রীড়াগত দক্ষতার স্পর্শে মাঠের খেলাতেও সেই প্রকল্প জীবন্ত হয়ে থেকেছে।

দুপক্ষে সেদিন অনেক তফাৎ ছিল। আকাশ-জমিন ফারাক। যে পার্থক্যের চিহ্ন ফলাফলই ধরে রেখেছে। এই পার্থক্যের মূল কারণ দৈহিক তারতম্য যতোটা, তার চেয়েও বেশী দক্ষতার ব্যবধান। তেমন শরীর, শক্ত মজবুত কাঠামো ভারতীয়দের কবেই বা ছিল? তবুও অতীতে ক্ষীণকায় ভারতীয়েরা সবলতর প্রতিপক্ষদের সঙ্গে সমানতালে যুঝেছেন। কখনো জিতেছেনও। কিসের জোরে?

জোর ওই দক্ষতারই। সেটুকু হাতে না থাকলে চলবে কি করে? যাঁরা বলছেন, রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামে ইরাণীয় স্বাস্থ্যই ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাথায় চড়ে বসেছিল, তাঁরা আধখানা কথা বলেছেন। বাকী আধখানা কথা আরও মূল্যবান: ভারত ইরাণীয় দক্ষতার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এই দক্ষতা শুধু দেহভিত্তিক নয়, ফুটবলের প্রাথমিক বিদ্যারও মুখাপেক্ষী।

নব্বই মিনিটব্যাপী খেলার একপর্বে সামর্থের শেষ বিন্দুটিকে উজাড় করে দিলে উত্তরপর্বে দমে যে টান পড়বে এতো জানা কথাই। প্রথমেই সব কিছু আস্ফালন আকাশে ছড়াবার চেষ্টা করা হলে উড়নচণ্ডীর মতো ফুরিয়ে যেতে সময় লাগে না। শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের সামর্থ ও দম অটুট রাখাও খেলার আর এক রীতি। কই, ইরাণীয়রা তো সেই সামর্থ ও দম উড়িয়ে দিলেন না ?

প্রথম পর্বের শেষদিকে তাঁদেরও কেউ কেউ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা মন্থর হয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে থেমেই পড়লেন যেন। এই থমকে দাঁড়ানোর অর্থ এই যে তাঁরা দম নিচ্ছেন। 'সেকেণ্ড ব্রেথ' ফিরে পেতে এইটিই সঠিক পথ পরিক্রমণ। সবই তাঁদের সুস্থ চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াকৃতির পরিচায়ক। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ, অনুকরণযোগ্য।

ভারত-ইরাণের ফিরতি পর্বের খেলার পর আজ দিকে দিকে কথা উঠেছে যে ভারতে এক একটি খেলার মেয়াদ বাড়ানো হোক ! নইলে নব্বই মিনিটের পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো না। কথাটা খাঁটি। কিন্তু আরও খাঁটি কথা এই যে প্রতিযোগিতামূলক খেলার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে অনুশীলনের মেয়াদ বাড়ানো হোক। আমাদের ছেলেদের স্বাস্থ্যের, আহার্যের এবং তাঁদের জীবনধারনের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া হোক। অনুশীলনে দক্ষতার ধার বাড়ে, মনে স্ফূর্তি জাগায়। কিন্তু বাড়তি প্রতিযোগিতায় সেই ধারে সময় সময় মরচে পড়ে যায়। অবসাদ জাগে।

প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়দের শেষ সামর্থ উজাড় করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানায়। আর অনুশীলনে আসে রেখে ঢেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ। একটি ব্যবস্থায় পুঁজিতে টান পড়তে পারে। অপরটিতে পুঁজি পরিণত হয়। এগিয়ে যাওয়া সব দেশই খেলে কম, অনুশীলন করে বেশী। শিক্ষাশিবিরে তাঁরা যতো সময় অতিক্রান্ত

করেন তার অংশবিশেষও প্রতিযোগিতার আসরে ব্যয় করেন না। অনুশীলন সঞ্চয়ে মূলধন জোগায়, যে মূলধন খাটে প্রতিযোগিতাতে। প্রতিযোগিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে মূলধনের অপচয়ও ঘটতে পারে।

কিন্তু আমরা উল্টো পথেই চলছি। তাই দক্ষতা বাড়ছে না। বরং সংখ্যাতীত প্রতিযোগিতার যূপকাষ্ঠে পড়ে দক্ষতাই ছাঁটাই হয়ে যেতে বসেছে। আমাদের পথ ফুটবলের উজ্জীবনের নয়। দক্ষতা বাড়াবার, জাতীয় ক্রীড়ার মানোন্নয়নের রাস্তাও এ নয়। এ হচ্ছে স্বাভাবিক বিপর্যয় বরণেরই নিশ্চিন্ত সড়ক। এই পথ থেকে আমাদের সরতেই হবে। দক্ষতা বাড়াতেই হবে। দক্ষতার বিকল্প কিছুই নেই।

অন্য মেজাজের ফুটবল

অসময়ের ফুটবল মরশুমী ফুটবলের চেয়ে অনেক উপভোগ্য হয়েছে। প্রতিযোগিতার সর্বাত্মক চাহিদা ছিল না। কাপ-শীল্ডের ঠুনকো মর্যাদা আসল খেলার মহিমার মাথায় চড়ে বসতেও চায় নি। তাই অসময়ে যে খেলা তাতাবানিয়ার কলকাতা সফরের সূত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি তা বোধকরি ভুলতে চাইলেও সহজে ভুলতে পারবো না।

আর ভুলতে চাইবোই বা কেন! সাচ্চা জিনিস মনের মণি-কোঠায় সাজিয়ে না রেখে তা ভুলে যাওয়ার অর্থই হলো হৃতসম্পদ হয়ে থাকা। সে এক ধরণের আহাম্মুকিতা। এই আহাম্মুকিতার উর্ধ্বে থেকে যা দেখেছি, যা পেয়েছি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চাই।

ফুটবলের প্রকৃত রসের কারবারী আমরা। আধুনিক ফুটবলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সাবেক কাল থেকে নতুন কালে এসে ফুটবল তার আগেকার খোলস ছেড়ে এক নতুন আঙ্গিকে সেজেছে। পথটা বদলে গিয়েছে। রূপান্তরিত ফুটবলের চেহারা আগের অনুপাতে অনেক চিকণ। রুচিস্নিগ্ধ। লাবণ্যময়।

আগেকার ফুটবলে অনিয়ন্ত্রিত যৌবনের দুরন্ত দাপাদাপির আস্ফালন ছিল। এখন যৌবনের স্বভাব সংযত। তখন বার কাঁপানো সট সারা মাঠেও কাঁপন ধরিয়ে দিতো। এখন সে জাতের সট নিশ্চিহ্নপ্রায়। জোরে সট মেরে অনর্থক বাড়তি পরিশ্রম করে কি হবে, যদি আস্তে ঠেলে বলটিকে গোলের ফাঁকে গলিয়ে দেওয়া যায়?

তিন দশক পর্যন্ত যে ফুটবল আমরা দেখেছি তাতে শরীরই

ছিল প্রধান পক্ষ। মন থাকতো যেন অলক্ষ্যে। আর আজ? মন চলেছে আগে আগে। শারীরিক সামর্থ সেই মনের নেতৃত্বকে শিরোধার্য মানছে। মন অবশ্য উভয়কালেই তার কাজ করতো, নইলে কখনই ভাল খেলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সেকালে মনের প্রকাশ পরোক্ষ। একালে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

সেকালের ফুটবল খেলোয়াড়দের সাধারণভাবে কর্মীরূপে গড়তো। একালে গড়ছে শিল্পী হিসেবে! ঈজেলের সামনে বসে কলাকার তুলিতে আঁচড় কাটেন, দেখতে দেখতে সামনের ছবিটা রংয়ে রসে ভরপুর হয়ে ওঠে। কোথা দিয়ে, কেমন করে নতুন সৃষ্টি ভূমিষ্ঠ হয়! একালের উন্নত ফুটবলও অবিকল তাই। খেলোয়াড়দের সক্রিয় মন এবং সৃজনধর্মী গতিশীলতা ক্ষণে ক্ষণে কতো দৃশ্যকাব্য যে রচনা করছে তার ঠিকঠিকানা কি!

তিন তিন দিন কলকাতার মাঠে তাতাবানিয়াকে সামনে পেয়ে আমরা সত্যিই এক অনাস্বাদিত আনন্দসায়রে ডুবে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। যে ফুটবল গোল গোল হুঙ্কারে শুধু চড়া মেজাজের অস্তিত্ব জাগিয়ে তোলে, তাতাবানিয়ার খেলা তার সঙ্গে অসম্পৃক্ত। উত্তেজিত হওয়ার অবকাশ কম। উপভোগ করার, রসে মজে থাকার সুযোগই বেশী।

তাতাবানিয়ার খেলোয়াড়দের পায়ে বলটি যেন আত্মসমর্পণ করতেই ব্যস্ত। পোষমানা বল একজনের কাছ থেকে আর একজনের নাগালে চলে যাচ্ছে যন্ত্রবৎ। বোঝাবুঝিতে এতোটুকু ভেজাল নেই। যেতে যেতে এ বাঁক ও বাঁক ফেরা। কখনো দ্রুত লয়। কখনো বা অলস মন্থরতা। কখনো সরল পথ। কখনো বা বক্রগতি। বিচিত্র ভঙ্গী বলের। কিন্তু লক্ষ্য অভিন্ন। যে পথেই হাঁটুক বা ছুটুক, বলটিকে যেতেই হবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

এই পথ পরিক্রমণে তাতাবানিয়ার খেলোয়াড়েরা ছিলেন যেমন সহজ, তেমনি স্বাভাবিক। অনুশীলনে ও অভ্যাসে কতো একাগ্রতা

থাকলে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া যায় তাও সহজে অনুমেয়। বল যেন আঠার মতো লেপটে ছিল ওঁদের পায়ে। সেই বল দিয়ে ওঁরা সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের ছক কেটেছেন সবুজ মাঠে। মাঠের গায়ে হয়তো দৃশ্যতঃ দাগ পড়ে নি। কিন্তু মাঠের চেয়ে আরও জীবন্ত যার অস্তিত্ব সেই মনের পর্দায় যে আঁচড় পড়েছে তার আয়ু অক্ষয়।

আধুনিক ফুটবল বলতে আমরা যা বুঝি তার চেহারা ছিমছাম। ফুটবলের বিধানে ফেয়ার চার্জ স্বীকৃত প্রক্রিয়া। কিন্তু জাত-ফুটবলে স্বীকৃত ও বিধিসম্মত এ কাজেরও বিশেষ দরকার পড়ে না। এ ফুটবলের সমগ্র অস্তিত্বই যেন তুলোর মতো নরম। কিন্তু কাজের হিসেবে জীবন্ত যৌবনের চেয়ে কম উপযুক্ত নয়।

কলকাতার আসরে তাতাবানিয়া অন্য মেজাজ এনে দিয়েছিল। একটা স্বপ্নালু উপলব্ধির প্রভাব ছড়ানো ছিল গ্যালারিতে। তাই হৈ চৈ, হট্টগোলের বদলে মুহুর্মুহু তারিফ আর মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জনে ভরে উঠেছিল সারা মাঠ। এই গুঞ্জনই জাত ফুটবলের জয়ধ্বনি।

ওঁরা খেললেন। আমরা হিসেব নিকেশের অবকাশ পেলাম। খেলবেন বৈকি ওঁরা! পুসকাস, হিদেগকুটি, ককসিস, বোজিকের উত্তরসূরী এই তাতাবানিয়ার খেলোয়াড়েরা। অপেশাদার ফুটবলে যে দেশের আজ শীর্ষসংজ্ঞা সেই হাঙ্গেরী থেকে তাতাবানিয়া এসেছিল। সুতরাং তাঁদের ভূমিকায় হাঙ্গেরীয় ফুটবলের অবিমিশ্র ছাপ থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

ওঁদের বিপক্ষে আমাদের ঘরের ছেলেরা কেমন খেলেছেন, পেছনের দিকে তাকিয়ে আজ একবার সেকথা যাচাই করে নিই। মোহনবাগান প্রথম দিনের প্রথমার্ধে সুবিন্যস্ত ক্রীড়া-রীতি অনুসরণ করে বিপক্ষকে সামাল দিতে ওঁদের মন্ত্রেই ফুটবলের পূজো করতে চেয়েছে। শেষরক্ষা হয় নি। কারণ, বড় তাড়াতাড়ি

সামর্থ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তবু এই সংক্ষিপ্ত স্মৃতির দাম কম নয়। হাজার হোক্, কলকাতার মোহনবাগানের সঙ্গে ওলিম্পিক জয়ী হাঙ্গেরীর একদল তাতাবানিয়ার তফাৎ আছে বৈকি।

দ্বিতীয় দিনে ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়ারীতির বিন্যাসে তেমন পরিপাট্য ছিল না। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তার লড়িয়ে মেজাজ বিসর্জন দিতে চায় নি। সবচেয়ে বেশী গোল হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তবু ইস্টবেঙ্গলের শানানো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ সময়েও মরচে ধরে নি। হারার আগে যে হারে না, মরার আগে যে মরতে চায় না, সে আর যাই হোক কাপুরুষ নয়।

আর তৃতীয় দিন আমরা যেন নতুন করে চিনলাম ভারতীয় দলকে।

তৃতীয় দিনের দ্বিতীয়ার্ধ ই ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগ! ভারতীয় দল তখন ঘামঝরানো মেহনতের সঙ্গে সুস্থ বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়েছে। পায়ের বলকে শূন্যে তুলতে প্রবল অনীহা। এণ্টনী তখন মাঝ মাঠের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রদীপ ব্যানার্জী তাতাবানিয়ার রক্ষণব্যূহের অলিগলি ঘুরে ফাঁক ফোকরের সন্ধানে ফিরছেন। রাইট উইং থেকে লেফট উইংয়েও উনি চলে এলেন। চুনী গোস্বামীর ড্রিব্লিংয়ের ধারে এক ও একাধিক খেলোয়াড়ের রক্ষণাত্মক বাঁধন কেটে গেল। পেছন থেকে দ্রুত-লয়ে এগিয়ে এসে উইং হাফ ইউসুফও উঁচু সটে তাতাবানিয়ার গোলরক্ষককে পরখ করে গেলেন।

কি খেলাই খেলেছিলেন তখন আমাদের ঘরের ছেলেরা! তাতাবানিয়ার খেলোয়াড়দের মতো ফুটবলের প্রাথমিক বিদ্যা তাঁদের অধিগত নয়, তবু নিখুঁত প্রকরণকে শিরোধার্য মানায় নিষ্ঠা ছিল। আর সেই আন্তরিকতার কল্যাণেই দ্বিতীয় পর্বে দুর্ধর্ষ তাতাবানিয়া পিছু হটে ভারতীয় দলকে এগিয়ে যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। খেলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে,

দ্বিতীয়ার্ধের বেশীর ভাগ সময় পায়ে পায়ে বল রেখে ভারতীয় দল খেলার গতিবিধির চেহারা ও চরিত্র বদলে দিলো। তবে গোল করতে পারলো না।

গোলের রাস্তা পরিষ্কার করেও শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। না পারুক। গোল করা ছাড়া বাকী কাজ যে প্রায় সুসম্পন্ন করেছে একথা মানতেই হবে।

মাসকয়েক আগে রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে ইরানের মুখোমুখি দাঁড়াবার কালে ভারতীয় দলের এ খেলা কোথায় ছিল? সেদিনে আর আজকে কতো তফাৎ! আজকের খেলা যদি ভবিষ্যতে খেলতে পারে তাহলে আন্তর্জাতিক আসরে ভারত হারুক বা জিতুক কিছু যাবে আসবে না। তাতেই আমরা ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে আশ্বস্ত বোধ করতে পারবো।

তবে নিয়মিত এই জাতের খেলা ভারতীয় দলের পক্ষে সম্ভবপর কি? সন্দেহ হয়। যাঁরা নিয়মিত সমমানের খেলা খেলতে পারেন ফুটবলে তাঁদের কৌলীন্যগর্ব আছে। ভারতীয় দল পারে না। তাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের অস্তিত্বও বিশেষ কিছু নেই। শুনেছিলাম, চোখে অবশ্য দেখি নি, যে রোমে ভারতীয় দল উঁচু ও সমমানের ফুটবল খেলায় সফল হয়েছিল। কিন্তু তারপর ইরানের সঙ্গে যে খেলা খেললো তা দেখে শোনাকথায় আস্থা রাখতে পারি নি। তাই বলছিলাম যে খেলার মানকে ধরে রাখতে হলে একটা নির্দিষ্ট মানে নিয়মিত খেলতেই হবে। আজ ভাল, কাল মন্দ। পরমুহূর্তে আবার সব কিছুতে ওলট্ পালট বাধানো সমমানের পরিচয় নয়।

নাতিশীতোষ্ণ নভেম্বরের শেষলগ্নে তাতাবানিয়া বনাম ভারতীয় দলের খেলা দেখে আর একটি উপলব্ধি জেগেছে।

জানা কথা, শরীরের দিক থেকে ভারতীয়েরা তেমন মজবুত নন। খাটবার ক্ষমতা তাঁদের কম। অল্পেতেই যেন বেদম হয়ে

পড়েন। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলারদের নভেম্বরের ভূমিকা দেখে ওই পরিচিত প্রবাদে সায় দিতে মন চায় নি।

সেদিনে দেখেছি যে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয়েরা মেহনত করছেন। নব্বই মিনিট খাটবার পরও কেউ ফুরিয়ে যান নি। এণ্টনী তো বোধহয় আরও নব্বই মিনিট সমানতালে খেলা চালিয়ে যেতে পারতেন! বরং শেষসময়ে তাতাবানিয়ার কোনো কোনো খেলোয়াড়েরই কোমরে হাত পড়েছিল।

ভারতীয় ফুটবলের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ দৃশ্য একেবারেই ব্যতিক্রম। তবে সুখকর সে নজীর। পরিশ্রমের এমন অপরিমিত ক্ষমতা এতো অফুরন্ত দম ভারতীয়েরা কোন্ মন্ত্রবলে সঞ্চয় করলেন?

বোধহয় স্বস্তিদায়ক নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকবে। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের ফুটবল মরশুমটিকে নির্দয় গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নাই বা কেন?

শীতের দুপুরে পরিশ্রমের ক্ষমতা বাড়িয়ে রাখে। ফুটবলে এগিয়ে যাওয়া সব দেশেই ফুটবল নাতিশীতোষ্ণ মরশুমে প্রতিষ্ঠিত। দেখে শুনে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে ফুটবলকে যদি আমরা সুষ্ঠু প্রকল্পেই রূপায়িত করতে পারি তবেই আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। নইলে নয়।

আমরাও পারি জাতের এবং অন্য মেজাজের ফুটবল খেলতে। অন্ততঃ তাতাবানিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয়েরা এক মুহূর্তের জন্যে তা পেরেছেন। তবে অন্যদের মতো বারে বারে সেই কাজ করতে হলে অনেক দিক আঁটোসাঁটো করে আগে থেকেই বেঁধে রাখতে হবে। সবার আগে স্বদেশীয় ফুটবলের সংগঠনে বিপ্লব বাধাতে হবে এবং খেলোয়াড়দেরও ফুটবলের প্রাথমিক বিদ্যা অনুশীলনে, অভ্যাসে ও সাধনায় রপ্ত করে নিতে হবে।

আমাদের সংগঠকদের ফুটবল চিন্তার কাঠামো বেনিয়াবুদ্ধির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হৈ চৈ বাধাতে তাঁদের যতোটা আগ্রহ সে অনুপাতে আসল খেলার মানোন্নয়নে আন্তরিকতা কম। নেই বল্লেই হয়। আর খেলোয়াড়েরা এক মুহূর্তের জন্যে অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত হয়ে উঠতে তাগিদ অনুভব করলেও ফুটবলের প্রাথমিক বিদ্যায় তাঁদের নিরঙ্কুশ অধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

সেই অধিকার পেতে হলে ফুটবলকে ডালভাতের মতো নিত্যকার জীবনপথে অপরিহার্য করে তুলতে হবে। তবেই পারা যাবে ফুটবলের সহজ স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে। যেমন পেরেছেন এই তাতাবানিয়ার খেলোয়াড়েরা।

জলসা জমেনি।

সায়াহ্নের অন্ধকার নামতে তখনও দেরী, কিন্তু মনের মুকুরে অন্ধকারের যে ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছিল তা থেকে মুক্তি পাবার পথ কই!

জলের ধারে 'জলসা' দেখতে গিয়েছিলাম। মনে সুর ছিল। রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামের জলসা—প্রদর্শনী ফুটবল সাজানো আঙিনা রংও ছড়িয়েছিল। লাল, নীল জামা গায়ে খেলোয়াড়েরা যখন মাঠে নামলেন তখন কতো প্রত্যাশা! কিন্তু ধাক্কা খেতে সবুর সইলো না। খেলা হলো বটে। কিন্তু খেলার মতো খেলা নয়। খেলা দেখার আনন্দের প্রতিশ্রুতিও কোথায় মিলিয়ে গেল। সুরের ছন্দ কাটলো। রংয়ের অস্তিত্বও মুখ ঢাকলো বিবর্ণ শূন্যতায়।

আসর ভাঙ্গতে মনের মধ্যে যতো জ্বালা, ততোই যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা শুধু আমারই নয়। সবাকার। সবাই এতোক্ষণ জমাটবাঁধা জনতার গায়ে মিশেছিলাম। সত্তর মিনিট ধরে চোখ চেয়ে দেখেছি। বড় বড় চোখে। মনের দরজা খুলে দিয়ে মিলিয়ে নিয়েছি। খতিয়ে, খুঁটিয়ে বুঝতে চেয়েছি। যতো চেয়েছি, ততোই আফশোষে কপাল চাপড়েছি।

খেলা ভাঙ্গতে ঘরমুখী জনতা গুটিগুটি পায়ে যখন পথে নেমেছেন, তখনই ভগ্ন আশার অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তখনকার আক্ষেপ বুঝি যাবার নয়!

মজাটা মাঠেই মারা গেল! পয়সাও বরবাদ। ছিঃ ছিঃ। এর নাম খেলা? এর চেয়ে কি ভাল নয় আন্তর্জাতিক ফুটবলের পাট্ গুটিয়ে নেওয়া!

আরও কতো মন্তব্য! শাণিত তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো কানে

বিঁধছিল। ভাগ্যিস, যাঁরা খেলেন আর যাঁরা ভারতীয় ফুটবলের লালনপালন করেন, তাঁদের জনতার ভীড়ে মিশে দিন কাটাতে হয় না। হলে হয়তো রবিবারের ওই অলুক্ষণে অপরাহ্ণে পাশের লেকের জলেই তাঁরা ডুব দিতে চাইতেন।

তবে ওঁদের আর কতোই দুষবো? দুষেই বা কি হবে? তাঁদের লজ্জায় কি আমাদের ভাগ নেই? ওঁরা তো আমাদেরই মাথার মণি। আশা, ভরসা। ফুটবলে জাতীয় মর্যাদা ধরে রাখার দায়দায়িত্ব কি আমরাই ওঁদের ঘাড়ে তুলে দিই নি? দিয়েছি, মানছি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, ঘাট হয়েছে। দায়িত্ব যে সব কাঁধের ওপর তুলে দিয়েছি তা যে এমন ঠুন্‌কো তা যদি আগে বুঝতে পারতাম!

আজ বুঝেছি। কিন্তু এখন থেকে বুঝেসুজে পথ চলার প্রেরণা পাবো কি? বলতে পারবো কি যে ফুরিয়ে যাওয়া সামর্থ দিয়ে পারের কড়ি কেনা যায় না? অনুরাগীদের হাঁকডাকে ওঁদের নামডাক যতোই হুংকার তুলুক না কেন, আসলে কাগজের বাঘ বাঘই নয়। ঘরোয়া খাঁচায় বন্দী থাকলে চেনা যায় না। চিনতে পারা যায় বিদেশীদের সঙ্গে এক আসরে এসে দাঁড়ালে।

ফস্ করে এতোবড় কথা এমন কঠিন উচ্চারণে একদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেলছি না। বলছি আরও দেখে এবং আরও যাচাই করে। বছরখানেক আগে ওই রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে ওঁদের আমি ইরাণের সঙ্গেও খেলতে দেখেছিলাম। ওলিম্পিক ক্রীড়ার বাছাই পর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সেটি। সেদিনের ছবির সঙ্গে এদিনের দৃশ্যকাব্যের মূলতঃ কোনো তফাৎ নেই। তবু এই এক বছর ধরে আমরা শুধু সময়ই নষ্ট করেছি।

সময় নষ্ট করেছি শুধুমাত্র পুরানো, প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের নিয়ে জাতীয় দল গড়ে। নতুন সম্ভাবনাকে খুঁজতে চাই নি। নতুন সামর্থকে গড়তে নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা এমনই নিঃস্ব হয়ে পড়েছি যে রুশদলের সঙ্গে প্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলার

কথা ওঠামাত্রই এক অবসৃত খেলোয়াড়কেও আবার দলে ফিরিয়ে এনেছি। এই কি সুস্থ চেতনা? না, মুস্কিল আসানের পথ?

চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা বুড়িয়ে যাওয়া সামর্থের পায়ে মাথা কোটেন না, অবসৃত কোনো 'তারকা' রাতারাতি দলে ফিরে অলৌকিক কীর্তি গড়তে পারবে বলে ভোজবাজীতে যাঁরা বিশ্বাস করেন না তাঁদের পথ কিন্তু একেবারেই আলাদা। তাঁরা ওই সোভিয়েট দেশেরই মতো।

মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ফুটবলে সোনার মেডেল পাবার পর পরপর ত্ব ত্বটি ওলিম্পিকে রাশিয়া বাছাই পর্বের বাধা ডিঙ্গোতে পারে নি। কি করলে ভবিষ্যতে পারা যাবে তারই সাধনা করছেন তাঁরা। তাঁরা আঠারো থেকে বাইশ বছরের উঠতি তরুণদের বেছে নিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে, সুযোগ সুবিধে, মায় আন্তর্জাতিক ফুটবলের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁদের মানুষ করতে চাইছেন। তিন বছরের সময় নিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের আশা, তিন বছরের চেষ্টায় ও আন্তরিকতায় তাঁরা আজকের অপরিণত সামর্থকে একদিন পরিণত ও উপযুক্ত করে গড়তে পারবেন।

পারবেন কি না পারবেন তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। এবং এতো করেও রাশিয়া ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাই পর্বের কঠিন বাধা ডিঙ্গোতে পারবে কিনা তাও অজানা। কারণ ফুটবলে এগিয়ে যাওয়া ইউরোপের সব অঞ্চলই তিন বছরের মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে! তবে তাঁদের চিন্তার ও উগ্যমের যে দাম আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু আমরা করছি কি? সেই থোড়বড়ি খাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড় নিয়েই মশগুল। আমাদের পথ তো উজ্জীবনের নয়, আত্ম-হত্যার। অন্যেরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমরা সৎ ও সুস্থ দৃষ্টান্তগুলিকে চোখ চেয়ে দেখতে চাই নি। সাধ করে গলায় এঁটেছি ফাঁস। আন্তর্জাতিক রীতিকে শিরোধার্য মানতে শিখি নি

অথচ আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় অংশ নিতে চেয়েছি। আমরা ফাঁকির রাস্তায় স্বর্গে পৌছুতে চেয়েছি। কিন্তু স্বর্গোদ্যানকে কি রবীন্দ্র-সরোবরে টেনে নামিয়ে আনতে পেরেছিলাম? পারি নি। কি করেই বা পারবো? কি আমরা খেলেছিলাম সেদিন যে পারবো?

কি খেলেছিলাম সেদিন দু-এক কথায় তার জাত যাচাই করা যেতে পারে।

বাঁশীর সঙ্কেতে খেলা সুরু হতেই মিনিট বারো-তেরো ভারতীয় দল উৎসাহভরে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তারপরই চুপসে যাওয়া ফানুসের মতো ভারতীয় উদ্যমের ইতি। এই বারো-তেরো মিনিটের মধ্যে প্রদীপ ব্যানার্জি এক-আধবার বল দিয়ে নিয়ে আক্রমণ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রুশ খেলোয়াড়দের গতির প্রাচীরে বাধা পাওয়ামাত্র প্রদীপের শিখা নিবু নিবু হয়ে এলো। চুনী গোস্বামী একদিকে চেয়ে যথারীতি একপাশে বল ঠেললেন। কিন্তু একপাশে জানকীরাম থাকায় বল গিয়ে পড়লো জলে। আর জলে পড়ার আফশোষে ফুঁসিয়ে চুনীও যথারীতি ঊর্ধ্ববাহু হলেন। ব্যাস্, তারপরই জারিজুরি সব শেষ। চুনীর চাকচিক্যও ম্লান। এবং সেইখানেই ভারতীয় দলের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার সমাধি।

বাকী সময়ে রুশদল হাতিয়ার শানিয়েছে আর ভারতীয় দল দেয়ালে পিঠ রেখে মুক্তির সন্ধানে ফিরেছে। তবু রাস্তা খুঁজে পায় নি। পাবেই কি করে বা? লড়াই যেখানে সেখানে লড়িয়ে মেজাজ না দেখালে বাঁচতে পারা যায় শুধু পরেরই দয়ায়। রুশদল গুটিকয়েক সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে টিঁকে থাকতে ভারতীয় দলকে যে সুযোগ দিল তা নিছক কৃপা ছাড়া আর কিই বা!

বিরতির পর চারজন নতুন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের পক্ষে মাঠে নামলেন। ফ্রাঙ্কো আর ইউসুফ মাঝমাঠে কিছুটা জায়গা করে নিলেন বটে, কিন্তু সামনের সারিতে অশোক চ্যাটার্জি ও অসীম মৌলিকে এবং প্রদীপ ব্যানার্জি ও রাজিন্দরমোহনে কোনো

তফাৎ খুঁজে পাওয়া গেল না। অবস্থা যেমনটি ছিল তেমনই রইলো। শুধু লোক বদল করা হলো নাম কা ওয়াস্তে। মৌলিকের মৌল গুণাবলীর কণামাত্র নমুনাও নজরে পড়ে নি—না সটে, না বাধা ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বে।

ঠেকা দিয়ে রুখছিলেন অরুণ ঘোষ, নঈম আর দলনায়ক জার্ণেল সিং। তাঁদের ব্যস্তসমস্ত ভূমিকা দর্শকদের নজরে পড়লেও ওঁরা যে ভাল খেলেছেন তা আমি বলতে পারি না। বিশেষতঃ সুখ্যাত জার্ণেল সিং তো ননই। তিনি জায়গা রাখেন নি বলেই রুশ দল দ্বিতীয় গোল করতে পেরেছে সহজে। তিনি বিপক্ষের গতি ও তৎপরতার আন্দাজ পান নি বলে কমপক্ষে বার তিনেক বল ঠেলে সতীর্থের কাছে পাঠাতে গিয়ে রুশ খেলোয়াড়ের পায়ে তা জমা দিয়েছেন।

তবে শুধু জার্ণেল সিংয়ের কথাই বা বলি কেন, রুশদলের গতি ও তৎপরতার নাড়ীর খবর ভারতীয়দের কেউ কি পেয়েছিলেন? পান নি। সে খবর জানতেও চান নি। এইটিই পরমাশ্চর্য! সত্তর মিনিট ধরে খেলার সুযোগ পেয়ে একজন ভারতীয়ও বুঝতে পারেন নি যে রুশেরা দরকারে কতো জোরে ছুটতে পারেন এবং কতো তাড়াতাড়িই বা বলের কাছে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। বুঝতে পারেন নি। বুঝতে চানও নি।

যাঁরা খেলতে নেমে অপরপক্ষকে বুঝতে পারেন না এবং বুঝতে চান না, প্রতিযোগিতার আসরে অসহায় সেজে থাকা ছাড়া তাঁদের কোন গতিও নেই। তাই রুশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে সেদিন ভারতীয় ভূমিকা অমন অসহায় বলে ঠেকেছে। চিন্তা করার, অবস্থা বুঝে মস্তিষ্ককে সজাগ রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ভারতীয়েরা সেদিন পূর্ব ধারণার জের মিটিয়ে শ্রেফ্ দাঁড়িয়েই থেকেছেন। যেন এদেশেরই কোন অখ্যাত দলের বিপক্ষে খেলছেন এই ভেবেই তাঁরা বল ধরতে এবং বল ছাড়তে গড়িমসি করেছেন! ফলে রুশ খেলোয়াড়েরা যখন

যা ইচ্ছে তাই করেছেন। যেভাবে খুসী তেমনি ভাবেই বলে ছোঁ বসিয়েছেন। জানি না, এর আগে আর কোনদিন ভারতীয় দলকে মনের দিক থেকে এমন দেউলে সেজে থাকতে দেখেছি কিনা।

কলকাতায় রুশ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের পক্ষে যাঁরা খেললেন তাঁরা কেউই নতুন খেলোয়াড় নন। বছর বছর দেখার দৌলতে তাঁদের সত্যিকারের সামর্থ সম্বন্ধে তেমন কোন আকাশ ছোঁয়া চাহিদা আমার ছিল না। তাঁদের সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত কোন প্রত্যাশা নিয়ে ভারতীয় দল বনাম রুশ দলের খেলা দেখতে রবীন্দ্রসরোবরে যাই নি। গিয়েছিলাম এই আশায় যে ভারতীয়েরা যা পারেন সেইটুকু উজাড় করে দিতে কসুর করবেন না। তাঁরা মেহনত করবেন, খেলতে খেলতে চিন্তা করবেন এবং বল দেওয়া নেওয়ায় যা স্বাভাবিক সেটুকু অন্ততঃ করতে পারবেন। সাধারণ খেলোয়াড়েরা যে কাজ সহজে করতে পারেন ভারতজোড়া নাম যাঁদের তাঁরা তা অসহজ করে তুলবেন না।

কিন্তু হায় আশা! মস্তিষ্কের সঙ্গে আড়ি পাতালে কি কেউ তাঁর নামের প্রতি সুবিচায় করতে পারেন? অতএব নামে কি আসে যায়! আসল কাজের পরিচয়ে ইয়া ইয়া নামডাকওয়ালাদের সেদিন চিনতেই পারা যায় নি। তাঁরা কোথায় মুখ লুকোলেন! আর আমরা ভারতীয় ফুটবলের অনুরাগীরা চোখের জলে লেকের জল আরও ভারী করে তুললাম। এই আমাদের অভিজ্ঞতা। এইটুকুই সত্যোপলব্ধি।

তবু তো রাশিয়া আগত এই দলটি এখনও অপরিণত। ফুটবলের প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনে এই দলের অনেকে পরিণত পাঠ পেলেও তাঁদের মধ্যে একজনকেও ফুটবলের সৃজনধর্মী কলাকার হিসাবে মনে হয় নি। রক্ষণব্যূহ গুটিয়ে মাঠ যখন ছোট হয়ে আসছিল তখন ভারতীয় দলের নড়বড়ে রক্ষণব্যবস্থার সামনেও এই দলের ফরোয়ার্ডদের বিচলিত হতে দেখেছি। নতুন ছক কেটে, প্রতিভাবানের সৃষ্টি হাতে নিয়ে অপরপক্ষকে সায়েস্তা করতে, নতুন

তরকিব দেখিয়ে বিপক্ষকে ফাঁদে ফেলতে তাঁরা পারেন নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে ওঁদের যখন নাম মাত্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে তখনই দেখেছি যে, ওঁদের পায়ের নীচেও মাটি সরে যাচ্ছে।

তাই যে যাই বলে বলুন, সোভিয়েটের এক অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় ভারত সফরকারী এই ফুটবল দলকে আমি তেমন উঁচু আসন দিতে নারাজ যে আসন অসঙ্কোচে বাড়াতে পারি নেট্টো পরিচালিত ভারত সফরকারী রাশিয়ার জাতীয় দল বা গত বছরের হাঙ্গেরীয় তাতাবানিয়ার উদ্দেশ্যে। গত ১৪ই নভেম্বর রবীন্দ্রসরোবরে তাতাবানিয়া বা ১৯৫৫ সালে ভারতসফরকারী রুশ ফুটবল দল যদি প্রতিপক্ষকে অমনি অসহায় অবস্থায় সামনে পেতো তাহলে ডজনখানেক গোলের ব্যবধান গড়তেও তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো না। আর তাহলেই বোধকরি ওই অবুঝ, বোঝাপড়া বিহীন, নিরর্থক ক্রীড়ারীতির যোগ্য দাওয়াইয়েরই ব্যবস্থা করা যেতো।

কলকাতার ২-০ গোলের হারের খবর পেয়ে দূর থেকে যাঁরা ফুটবলে ভারতীয় সামর্থের হদিশ জানতে যাবেন তাঁরা কেবল ভুলের ফাঁদেই পা বাড়াবেন। চোখে যাঁরা দেখেন নি তাঁরা সত্যিই ভারতীয় ফুটবলের সঠিক নমুনার আন্দাজ পাবেন না। মান বোঝাতে হার এবং জিতই সব নয়।

যে রাশিয়া গত দু বছর ওলিম্পিক ফুটবলের মূল আসরে উপস্থিত হবার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে নি তারই এক অঙ্গরাজ্য দল রবীন্দ্র সরোবরে ভারতীয় ফুটবলকে নাস্তানাবুদ করে আমাদের আসল মানকে চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আরও বলার কথা এই যে, সফরকারী এই দলের খেলোয়াড়েরা হলেন অঙ্গরাজ্যের বিখ্যাত দলগুলির দ্বিতীয় সারির খেলোয়াড়। ওঁরা স্বদেশে এখন লাইনের ধারে বসে রিজার্ভ খেলোয়াড়ের জামা গায়ে এঁটে শুধু খেলাই দেখে যান। মাঠে ঢোকার পাশপোর্ট এখনও সংগ্রহ করতে পারেন নি।

সে মূলধন ওদেশে যাঁরা হাতে পেয়েছেন তাঁরা কতো উঁচুতে তাই ভাবি। আরও ভাবনা, আমারা আছি কোথায়! দেশে ফুটবলের ঢাকে নিত্যই কাঠি পড়ছে। আন্তর্জাতিক খেলাতেও কামাই নেই। কিন্তু এতো সবের পরও আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোথায়? কবে পাতাল ছেড়ে ওপরে উঠতে পারব?

আর যদি উঠতে না পারি তাহলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে যোগ দিয়ে হবেই বা কি? খেলার উদ্দেশ্য কি লোক হাসানো? অনুরাগীদের নরম মনে প্রচণ্ড ঘা বসানো?

মিথ্যে বলবো না, ওই রবিবারে রবীন্দ্র সরোবরে ভারতীয় ফুটবল দলকে দেখতে না গেলেই আমি ভাল করতাম। দেখে চমকে উঠেছি। বুঝেছি, লোকসানেরই কপাল আমাদের। ভারতীয় ফুটবল আজ সত্যিই ফাঁকিতে পড়েছে।

পপলুহার ও তাঁর সঙ্গীরা

অসময়ের বর্ষণে পৌষালী অপরাহ্নের মেজাজ গিয়েছিল বিগড়ে। কিন্তু চোখের সামনে জাত ফুটবলের রুচিস্নিগ্ধ চেহারা দেখে গোমড়া মুখে হাসি ফুটতে দেরী হল না।

ভোর থেকেই বৃষ্টি ঝরছিল। টিপ টিপ বর্ষণে কামাই নেই। কখনো আবার ঝরঝর করে অঝোর ধারায়! শীতের দিন। হিমেল হাওয়ার ঝাপটা শরীরে ফুটছিল আলপিনের মত। মাঠ জলে সপ্‌সপে। কাদায় হড়হড়ে। বাতাস আর্দ্র। মনও তাই ভার। এমন দুর্যোগে ফুটবল কি জমবে?

জলের সঙ্গে ফুটবলের আড়ি নেই বটে। কিন্তু তা বলে শীতের বাদুলে বেলায় খোলা আকাশের নীচে বসে খেলা দেখার লোভ কারুর কাছেই লোভনীয় নয়। এমন দিনে র‍্যাপারের আঁচলে মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাজে, অবসাদে বেলা কাটিয়ে দিতেই ভাল লাগে। মন যদি আনচান করে তবে বড় জোর কবিকণ্ঠে সুর মিলিয়ে ভাঁজাও চলে 'এমনি দিনে তারে বলা যায়।'

কিন্তু তবুও স্যাঁতসেতে শীতের সপ্‌সপে মাঠ ঘিরে রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামে লোক জমেছিল। কাতারে কাতারে না হলেও জমাটবাধা ভীড় নিতান্ত পাতলাও নয়। ঘণ্টা দেড়েকের ওপর তাঁরা পৌষালী অনাচার সইলেন। কনকনে বাতাসে কাঁপলেন। ঝিরঝির বৃষ্টিতে কাকভেজা ভিজলেন। কিন্তু ফাঁকিতে পড়লেন না কেউই।

দুপুরের অনিশ্চিত মন বিকেলে পাওয়ার আনন্দে ভরপুর। আরম্ভের আগে সংশয় ছিল যতো সমাপ্তিতে তা নিশ্চিহ্ন। ঘরমুখী জনতা তখন ব্রাতিশ্লাভের জয়ধ্বনিতে সোচ্চার। সত্যিই, ওঁরা

খেলতে জানেন। খেলা বলে একেই। এর নামই জাত ফুটবল। যেমন দেখতে তেমনি মন কাড়তে। এবং কাজের কাজ করে তুলতেও অদ্বিতীয়। এই খেলাকে শিল্পের মর্যাদা দিতে কেই বা আপত্তি তুলবে! আবহাওয়া বেয়াড়া ছিল তবু ফুটবলের শিল্পসম্ভারে স্টেডিয়াম সেজেছিল ফ্রেমে আঁটা ছবির সাজে। ফুটবল পাগল কলকাতার ফুলবল প্রেমে যেমন ভেজাল ছিল না তেমনি ব্রাতিশ্লাভের ফুটবলেও খাদ ছিল না এতোটুকু।

এক 'পাগল' খেলা সাঙ্গ হওয়ার পর আমার সঙ্গে দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসছিলেন। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাঠে হাজিরা দিয়েছিলেন যখন তখন তিনি ফুটবল ভালবাসেন বটে। তবে বেশী ভালবাসেন নিশ্চয়ই মোহনবাগানকে। কারণ তাঁর সে অনুরাগকে আমিও চিনি। যে সে লোক নন! নগরজীবনে নামকরা ব্যক্তি। বিধান পরিষদের জবরদস্ত সদস্য। ঘোর বামপন্থী। আলোচনায়, সমালোচনায় প্রতিদিন পরিষদের বদ্ধ কক্ষে উত্তাপের ঝড় বইয়ে ছাড়েন। খোলা মাঠের মিটিংয়েও তাঁর উত্তপ্ত চেহারা। কথায় খই ফোটানই তাঁর কাজ ও অভ্যাস। কিন্তু ওই অপরাহ্ণে ওঁর মুখেও চাবিকাঠি পড়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখলেন?

উত্তর এলো, দেখলাম বটে! এখনও দেখছি আর ভাবছি! বলতে বলতে আবার সেই আত্মনিমগ্ন তপস্যার আড়ালে অমন মুখর মানুষটির সমগ্র অস্তিত্ব গা ঢাকা দিয়ে বসলো। দেখার যেন শেষ নেই। ভাবনারও নেই অন্ত!

ভাবনা কিসের? আসছে কাল মোহনবাগানকে এই ব্রাতিশ্লাভের সামনে দাঁড়াতে হবে। তাই কি উনি ভয়ে জড়োসড়ো? না। সে ভাবনা নয়। আরও বড় ভাবনার ছায়া ওঁর মনে। সে ভাবনায় আমার, আপনার, সবাকারই ভাগ রয়েছে।

ভাবনা ঘরের ছেলেদের ঘিরে। ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে।

ওই ব্রাতিশ্লাভ দল ফুটবল খেলে। আমরাও খেলি। দুপক্ষে কোনো তুলনাই চলে না। কিসে আর কিসে! সোনায় আর সীসেয়! আমরা খেলি বটে। কিন্তু কি খেলি? ভাবতে গেলে মুণ্ডু ঘুরে যায়। কেমন যেন অশ্রদ্ধার অন্ধকার মনের আকাশ জুড়ে বসে।

এই নৈরাশ্যময় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে কবে যে আমরা মুক্তি পাবো! কিন্তু আমরা কি সত্যিই মুক্তি পেতে চাই?

'নাবালক' রুশ দল দীর্ঘমেয়াদী সফরে এলো। তারপর এই ব্রাতিশ্লাভ। কিন্তু কই? দু দুটি সফরকে তো জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্যে কোনো চেষ্টা করা হলো না। সেই থোড়বড়ি খাড়া, খাড়াবড়ি থোড়। আসরে নামানো হলো পুরানো, বয়স্ক এবং প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া দেশীয় খেলোয়াড়দের। যাঁদের সামর্থ একটি বিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে তাঁরাই খেললেন। যাঁদের ভবিষ্যত আছে, যাঁরা উঠতি তাঁদের ভাগ্য রবাহতের মতো। আমাদের ফুটবলের দৈন্যদশা দেখে সুস্থ, সৎ, দেশপ্রেমিকেরা দুঃখিত হলে কি হবে, এ দুঃখে তাঁদের কোনো ভাগ নেই যাঁরা এদেশে ফুটবলের লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বছর বছর বিদেশী দল আসুক। আসর জমুক। ঘরের টাকা বিদেশীদের কিছু দিয়ে নিজেদের ঘরে মোটা টাকা তুলতে পারলেই তাঁরা খুশী। তাই তাঁরা একটি ফাঁকা উদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রেখে বছর বছর দেশের ফুটবল মাঠের বহিরঙ্গে রং চড়াচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় ফুটবলের ভেতরটা থেকে যাচ্ছে যথারীতি ফাঁপাই। সাধারণ মানুষ চান, ভারতীয় ফুটবল নীচের মহল ছেড়ে ওপরে উঠুক। কিন্তু ফুটবলের অসাধারণ কর্মকর্তাদের চাহিদা ভিন্ন। এই চাহিদা জাতীয় ফুটবলের মুক্তি ঘটাতে পারে না। জাতে তুলতেও না।

ব্রাতিশ্লাভের হাতে আই এফ এর বাছাই দল এবং ডাকসাইটে

মোহনবাগান গুনে গুনে পাঁচটি করে গোল খেলো। জাতীয় ফুটবলের মানের নমুনার আন্দাজ ধরিয়ে দিয়ে গেল ব্রাতিশ্লাভ দল। আই এফ এ দলে ও মোহনবাগানে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের বদলে যদি জন তিরিশেক তরুণ ভারতীয়দের মাঠে নামানো হোত তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো নাকি? তরুণেরাও হারতেন। হয়তো আরও বড় ব্যবধানে। কিন্তু যাঁরা খেললেন তাঁদের অনেকেরই বেলা পড়ে এসেছে। তাই তাঁদের খেলিয়ে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত গড়ায় কোন্ মহৎ কর্তব্যটি যে সম্পাদনের চেষ্টা হলো তাই ভাবি!

ভাবতে গেলে খেই খুঁজে পাওয়াই ভার।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ফুটবল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বছর তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ। জাতীয় নিয়ামক সংস্থা গড়ে ওঠার ছ' বছরের মধ্যেই চেক দল অ্যানটোয়ার্প ওলিম্পিকে ফাইনালে উঠেছিল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়ায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় ওলোট-পালট ঘটে গেলেও, চেক ফুটবল দল ১৯৬২ সালে চিলিতে বিশ্ব ফুটবল কাপের এবং গত বছরে টোকিওতে ওলিম্পিক ফাইনাল খেলেছে।

আর আমরা?

চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো না হলেও, আমরাও তো কমদিন ফুটবল খেলছি না। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ঘিরে আমাদের ফুটবলের গলাবাজিও মিইয়ে পড়ে না কখনো। পয়সাকড়িও অঢেল ঢালা হয় এদেশের ফুটবলে। তবু ওদের পাশে আমরা বেমানান। অবস্থাটা মানতে বাধ্য হচ্ছি বটে। কিন্তু কেন মানবো? আর যদি মানতেই হয়, তাহলে খাঁটি সত্যকে পুরোপুরি মেনে বিদেশী দলের সঙ্গে ততোদিন না খেলাই তো ভাল যতোদিন না আমরা উপযুক্ত হয়ে উঠি।

উপযুক্ত হয়ে ওঠার কোন চেষ্টা করবো না অথচ বিদেশীদের

সঙ্গে খেলবো এমন অকারণ বিলাসিতাকে চিরদিন প্রশ্রয় দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। তাই বলি যে হয় বিদেশীদের দেখে তাঁদের পথ অনুসরণে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবো এই প্রতিজ্ঞা আমাদের নিতেই হবে। আর তা যদি না পারি তাহলে শক্তিশালী বিদেশী দলগুলির সঙ্গে খেলার আশা আমাদের ছাড়তে হবে। শুধু এক দুদিনের তামাসার জন্যে অথবা মোটা টাকা এহাত ওহাত করার ফিকিরে বিদেশী ক্রীড়াবিদদের যখন তখন এদেশ সফরের ব্যবস্থায় সায় দেওয়া চলে না। ব্যাপারটার এস্‌পার ওস্‌পার করার সময় এসেছে।

কথাটা যদি আজও না বুঝতে চাই, তাহলে একটা কেন শত শত ব্রাতিশ্লাভ দল এদেশে এসেও আমাদের মুক্তির পথ চেনাতে পারবে না।

শ্লোভান ব্রাতিশ্লাভে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাসায়নিক কারখানার কর্মীরা খেলেন। স্বদেশে দলটির নামডাক খুব। আসন সিনিয়ার ফুটবলের একেবারে প্রথম সারিতে। যুদ্ধোত্তরকালে ব্রাতিশ্লাভ বারছয়েক জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের মর্যাদা পেয়েছে এবং নিয়মিতভাবেই জাতীয় দলে খেলোয়াড় জুগিয়ে আসছে।

কলকাতায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে চেক জাতীয় দলের অনেকেই ছিলেন। ফুলব্যাক আরব্যান টোকিও ওলিম্পিকের ফাইনালে এবং গোলরক্ষক স্রুয়ফ ও স্টপার পপলুহার ১৯৬২ সালে চিলিতে বিশ্ব ফুটবল বা জুলে রিমে কাপের ফাইনালে ব্রেজিলের বিপক্ষে খেলেছিলেন।

স্রুয়ফ এক সময় বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদের একজন হিসাবে পরিচিত। আজ অবশ্য তাঁর পড়ন্ত বেলা। পপলুহারের মাথার চুল পাতলা হয়ে এলে কি হবে গত বছরেও তিনি বিশ্বের বাছাই দলে জায়গা পেয়েছিলেন। অসংকোচে বলা যায় যে, পপলুহারের মত বড় ফুটবল খেলোয়াড় আমাদের দেশে আগে আর আসেন নি।

যেমন চেহারা, তেমনি তাঁর খেলা। মাথায় ছ' ফুটের ওপর। হাতপায়ের পেশীগুলি সুগঠিত। গতি দুরন্ত নয়, কিন্তু খেলার গতিবিধি আন্দাজে তিনি ছোটেন সবার আগে। একটি মানুষ যেন সারা মাঠের অনেকখানি জুড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যূহের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে সেনাধ্যক্ষ যেমন তাঁর বাহিনীকে পরিচালিত করেন ঠিক সেই কায়দায় এবং অবিকল তেমনি আস্থাভরেই।

পপলুহার প্রথম দিনে একটি বল বাজে পাশ করেন নি। না কিকে, না হেডে। ব্যাক ভলিতে একটি বল পাশ করলেন দেখে বর্ষণসিক্ত কুঁকড়ে থাকা মাঠের মেজাজ গেল বদলে। কি তরকিব আর কি পরিমিতবোধ! শক্ত কাজ কতো সহজেই তিনি সাধ্যায়ত্ত করলেন। অথচ বাড়াবাড়ি নেই। যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী করার দরকারই বা কি ?

লেফ্‌ট ইনসাইড জক্‌ল, রাইট উইং সোয়েৎলার, লেফ্‌ট উইং তোমানেক এবং ব্রাতিশ্লাভের আর সবায়েরই এই পরিমিত বোধ লক্ষ্য করার মতো। কেউ বাড়াবাড়ি করেন নি বরং দরকারে লুকানো বাড়তি মূলধন উজাড় করে দিয়েছেন।

আধুনিক ফুটবলে যখন তখন সট নেওয়ার অভ্যাসটা ক্রমশঃই সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ, গোলে সট করে যদি গোল না দেওয়া যায়, তাহলে সট করা বোকামি। বল চলে যায় অপরপক্ষের নাগালে। কিন্তু বিপক্ষের দুর্বলতার সন্ধান যদি একবার পাওয়া যায়, তাহলে পা দুটিকে গুটিয়ে রাখাও নিরর্থক।

ব্রাতিশ্লাভ দল রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামে সেই দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছিল। জানতেন যে, অপরপক্ষের নাগালে বল গেলেও তাঁদের আশঙ্কার কিছু নেই। তাই কিঞ্চিৎ অকৃপণ মেজাজেই যেন তাঁরা সট করেছেন। যখন তখন এবং দ্বিতীয় দিনে কিছুটা এলোপাথাড়ি ভাবে। কিন্তু প্রথম দিনে ?

প্রথম দিনের সটগুলি শুধু জোরালোই নয়, নিশানায়ও স্থির।

পাঁচটি গোল তো হলোই। উপরন্তু বারকয়েক সেই সট বার কাঁপিয়ে ফিরলো। সবচেয়ে ভাল সুটার জক্‌ল। দ্বিতীয় দিনে তিনি খেলেন নি। হয়তো তাই সেদিন দলের সুটিংয়ের মান কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। হাড়ে হাড়ে কাঁপন ধরানো এই সুটিংয়ের বহর দেখে মনে হয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে যে সব বিদেশী ফুটবল দল কলকাতায় এসে খেলেছে, তাদের সকলের চেয়ে এই ব্রাতিশ্লাভ দল সুটিংয়ে বেশী রপ্ত। এবং বল আয়ত্তে রাখার বিষয়েও।

কি কণ্ট্রোল, কি কণ্ট্রোল! বলতে বলতে আমরা হাঁপিয়ে উঠছিলাম। জলকাদার পিচ্ছিল মাঠ, তবুও বলে-পায়ে যেন আঠা লেপটানো। হাত ছাড়া সর্বাঙ্গকে ওঁরা কাজে লাগাচ্ছিলেন। ইনসাইড, আউটসাইড ড্রিব্লিংয়ের ছোট ছোট কাজেই বা কি নিশ্চিত সাফল্য ও প্রত্যয়। ওঁদের পাশে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা অকারণ ছটফট করছিলেন। প্রত্যয় অবিচল ও দক্ষতার মূলধন না থাকলে ছটফটানির হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। এই প্রত্যয় ও দক্ষতা অর্জনে ব্রাতিশ্লাভের খেলোয়াড়েরা মাঠ ও মাঠের বাইরে যে কত প্রহর কাটিয়েছেন, খেলেছেন এবং চিন্তা করেছেন, তা ভাবতে গেলেই আমাদের অবাক হতে হবে।

অনুশীলন ছাড়া দক্ষতা অর্জনের বিকল্প রাস্তা নেই। আর সেই দক্ষতার মূলধন একবার হাতে এসে গেলে দক্ষ ক্রীড়ারীতি যে খেলোয়াড়দের অঙ্গে ও মনে সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো এটে বসে যায় সে কথা কে না জানে? যারা জানতো না তারাও ব্রাতিশ্লাভের খেলোয়াড়দের কলকাতায় দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

ওঁরা শুধু পা দিয়ে আর গতর খাটিয়ে ফুটবল খেলেন নি, বেশী খেলেছেন মাথা খাটিয়ে। তাই সক্রিয় চিন্তার আশীর্বাদে ছোট বড় পায়ের ও শরীরের কাজ শিল্পের পর্যায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে ওঁদের ভূমিকা সৃজনধর্মী। নিত্য নব পথে প্রতিভাত।

কত রকমে, কত পরিপাটি বুনোনে নিজেদের খেলার ছক গড়েছেন। দরকারে গড়া জিনিস ভেঙ্গেছেন এবং আবার গড়েছেন। এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছে যে পায়ের খেলাতে মাথার ভূমিকাও মস্ত।

শ্লোভান ব্রাতিশ্লাভ দলের নেতা ডাঃ হেনজেল বলছিলেন, মাঠ ও আবহাওয়া শুকনো থাকলে তাঁরা আরও ভাল খেলা দেখাতে পারতেন। নিশ্চয়ই পারতেন। তবে যা দেখিয়েছেন ওঁরা তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। যে খেলায় উত্তেজনা ও দাপাদাপির অন্ত নেই সেই ফুটবলকে পরিচ্ছন্ন মেজাজে, সূক্ষ্ম হাতে এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে ফুলের সাজে সাজাতে পারেন যারা তাঁরাই ফুটবলের জাতশিল্পী। তাঁরা রবীন্দ্র সরোবরস্থ স্টেডিয়ামে দুদিন দু হাতে অমূল্য ঐশ্বর্য বিলিয়েছেন। ওঁদের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই।

ফুটবলের এই বৈভব কবে আমাদের ঘরে উঠবে? দেখার ভাগ্যে তো আমরা একেবারে বঞ্চিত নই। তাই জিজ্ঞাসা, শিখবো কবে? কবে ওঁদের পথে চলতে, নিষ্ঠায়, পরিশ্রমে ও চিন্তায় কবে পারবো আমরা ওঁদের পদে পদে অনুসরণ করতে? ওঁরা খেলেন, আর আমরা দেখি। দেখা কেন, যদি না শিখতে পারি? শিখবো কবে? কবে বলতে পারবো যে ওঁদের পাশাপাশি দাঁড়াবার মত মূলধন আমরাও সংগ্রহ করতে পেরেছি?

গুরু বিয়োগ

ফুটবল দেখে শেখা যায়। ঠেকেও শেখা যায়। আর যায় শেখা উপযুক্ত গুরুর কাছে পাঠ নিয়ে পাখী পড়ার মতো মুখস্থ করে।

দেখে ও ঠেকে শেখার প্রতি আমরা মন দিতে পারি নি। তবে পাখী পড়ানোর কাজে হাত দিয়েছিলেন এক গুরু। কিন্তু ভাগ্যে তাও সইলো না! বড় তাড়াতাড়ি তাঁকেও সরে যেতে হলো!

গুরু জনাব এস এ রহিম। ফুটবল কোচ। জাতীয় শিক্ষাগেহে মাত্র কটি বছর কাটাতে পেরেছিলেন। তারপরই সেই দুঃসংবাদ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো, রহিম সাহেব নেই! হায়দ্রাবাদে স্বগৃহে ১৯৬৩ সালের ১১ই জুন তাঁর জীবনাবসান। রোম ওলিম্পিক এবং জাকার্তা ক্রীড়ায় জনাব রহিম আশার একটি ক্ষীণ শিখা জ্বালিয়ে ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা দিয়ে কি যে ঘটে গেল!

কি যে গেল হারিয়ে তা বুঝতেও বুঝি অনেক সময় লাগবে!

জাতীয় ফুটবলের আজ যুগসন্ধিক্ষণ। সনাতন প্রকরণের বিকল্পে সবে আধুনিক ক্রীড়ারীতির প্রবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষের ফুটবল এককাল থেকে আর এককালে পা মেলেছে যখন, সেই লগ্নেই বিদায় নিলেন যুগধারক শিক্ষাগুরু। পুরানো কাঠামো সংস্কার করে জাতীয় ফুটবলকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে জনাব রহিম যেদিন সাফল্যের প্রথম সূত্রটির সন্ধান পেলেন সেইদিনই তাঁকে অন্যলোকে পাড়ি দিতে হলো!

এ এক আশ্চর্য বিয়োগ! রহিম সাহেব যেন এক নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জাকার্তা ক্রীড়ার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত। জাকার্তা ক্রীড়ার স্বর্ণপদকটি ঘরে তোলার পরই তাঁর ছুটি। মনে মনে যেন তিনি তাই প্রার্থনা করছিলেন। ভাঙ্গা শরীর

আর বইছিল না। তাই বুঝি মনের কথাটিকে মুখের ভাষাতেও প্রকাশ করেছিলেন সেদিন।

সেদিন ছিল জাকার্তা ক্রীড়ার ফুটবল ফাইনালের আগের সন্ধ্যা। রাজনীতিক সংগঠকদের উস্কানিতে সারা ইন্দোনেশিয়া সেই মুহূর্তে সোন্ধী বিরোধে, ভারত বিদ্বেষে সোচ্চার। ইন্দোনেশীয় গণমানসের বিকৃত বিক্ষোভে বাইরে প্রচণ্ড উত্তাপ। ক্যাম্পে দুয়ার এঁটে বসে আছেন রহিম। তাঁকে ঘিরে ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়েরা।

আগামীকাল ফাইনাল। অকরুণ অগ্নি পরীক্ষা। যুঝতে হবে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত যার কাছে হেরেছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করছেন ভারতীয়েরা। অনুচ্চারিত কণ্ঠে আলোচনা। বিশ্লেষণ চলেছে খসড়া ক্রীড়া পরিকল্পনার। হঠাৎ রহিম সাহেবের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠলো,

'তোমরা দেশকে ভালবাসো তো ইন্দোনেশীয় অবিচারের জবাব দাও। খেলে হারাও কোরিয়াকে। মনে রেখো, না পারলে ওরা আরও হাসবে। শাস্ত হবে তোমরা জিতলেই।'

'তোমরা তোমাদের কোচকে ভালবাসো কি ? যদি বাসো তো জাকার্তার সোনার মেডেলটি আমায় উপহার দাও। অনেক দিন রয়েছি তোমাদের সঙ্গে। আমার দিনও ফুরিয়ে আসছে। আগে কখনো কিছু চাই নি। আজ চাইছি। কারণ, জানি ওই মেডেলটি আমাকে উপহার দেওয়ার সাধ্য তোমাদের আছে।'

কি যেন মাখানো ছিল রহিম সাহেবের কণ্ঠে। সাধ্য আছে। ক্ষমতা আছে। গুরুবাক্য শুনে খেলোয়াড়েরাও যেন আত্মস্থ হয়ে পড়লেন। পরের দিন নতুন প্রেরণায় তাঁরা নিজেদের ছড়িয়ে দিলেন মাঠের মধ্যে। দৌড়ে, ঝাঁপিয়ে, লাফিয়ে, বেগবান প্রাণের স্পর্শে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বাত্মক চেষ্টার উর্ধ্বে।

ভারতের জয়ে নিন্দুকের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। জাতীয় কোচ আবেগে, কৃতজ্ঞতায় খেলোয়াড়দের বুকে জড়িয়ে বলে উঠলেন,

'ধন্য তোমরা! আমার কাজও শেষ হয়েছে!'

সত্যিই তাঁর কাজ বরাবরের মত শেষ হয়ে গেল। ভাগ্য তাঁকে নতুন করে কাজে হাত দেবার জন্যে আর ফুরসৎ দেয় নি।

মনে রাখা দরকার যে প্রথম অঙ্কে পরাজিত ভারতের পক্ষে পঞ্চমাঙ্কের বাজীমাৎ করা যে সম্ভবপর, নাটকের পট উত্তোলনের আগেই রহিম সাহেব সেকথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্ভাবনা ও সামর্থের সঠিক হদিশ। তাই তিনি একজন সফল কোচ।

শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা, সামর্থ চিনতে পারাই শিক্ষাগুরুর আসল কাজ। তাঁদের দিয়ে কাজ তুলিয়ে নেওয়াও। যা তাঁদের সাধ্যাতীত তা সাধ্যায়ত্বে আনার জন্যে বিচক্ষণ কোচেরা কোনো দিনই পেড়াপেড়ি করেন না। রহিম সাহেবও করতেন না। যথার্থ কোচ যিনি তাঁর কাজ শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ারীতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো নয়। বড় কাজ তাঁর শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

দল সম্পর্কেও তাঁর কাজ একই। যা সম্ভবপর তাই নিয়ে তিনি মাথা ঘামান। অসম্ভব মরীচিকার পেছনে মাথা কোটেন না।

জাকার্তা ও রোমের অভিজ্ঞতাতেই সেকথা আরও স্পষ্ট করে বোঝা যেতে পারে। ভারতের পক্ষে জাকার্তা ক্রীড়ার স্বর্ণ সঞ্চয় করা সম্ভবপর ছিল, ছিল না ওলিম্পিকের পদক অর্জন করা। তাই রহিম সাহেব রোমে শুধু শোচনীয় পরাজয় এড়াবার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা এঁটেছিলেন। আর জাকার্তায় চেষ্টা করেছিলেন অন্যদের হার মানাতে। দুটি ভিন্নমুখী পরিকল্পনার স্বতন্ত্র পরিচয়ে কোচ রহিমের স্বকীয় পরিচয়ই জড়িয়ে রয়েছে।

উপযুক্ত কোচের প্রচলিত ক্রীড়ারীতি এবং পূর্বধারণা সম্পর্কে

কোনো গোঁড়ামি থাকে না। রহিম সাহেবেরও ছিল না। বরং বলা যায় যে, নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় আগ্রহ দেখাতে তাঁর সাহসে কোনো ঘাটতি পড়ে নি কখনো। এক হিসেবে তিনি ছিলেন অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়।

পিছিয়ে-থাকা বা 'উইথড্রয়িং' সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব যখন প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ডেরা পালন করতে পারেন নি, তখন রহিম সাহেব লব্ধপ্রতিষ্ঠ উইং হাফ ব্যাককে সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পদাভিষিক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এমন কি স্টপারকে দিয়েও তিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ডের কাজ করিয়ে নিয়েছেন। জাকার্তায় জার্নেল সিংয়ের কথা মনে আছে তো?

জাকার্তা ক্রীড়ার শেষ পর্বে জনাব রহিমের মনে হয়েছিল যে এমন একজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডের প্রয়োজন যাঁর মুলধন হবে মনের সাহস ও দেহের সামর্থ। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়ার জোয়ানেরা প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলাতে গায়ের জোর ফলাতেও কসুর করেন না। অতএব তাঁদের অস্ত্রেই তাঁদের বাগ মানাতে হবে।

তাই ডাক পড়লো জার্নেল সিংয়ের। জার্নেল সিং ফুটবল খেলেন স্টপার হিসাবে। রক্ষণব্যূহের মধ্যমণি তিনি। গুরুর নির্দেশে তাঁকেই এগোতে হবে পুরোভাগের নেতৃস্থানে। ইতস্ততঃ করছিলেন জার্নেল নিজে। রহিম বল্লেন, ঘাবড়াও মাৎ। তোমার কাজ হবে 'স্টিম রোলারের' মতো গড়িয়ে যাওয়া। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুতি, ফাউল, কোনো কিছুতেই পেছপাও হবে না। ফরোয়ার্ড হিসেবে দক্ষতা না দেখাতে পারো, দৃঢ়তা দেখাতে ভুলো না কিন্তু।

জার্নেল সে কথা ভোলেন নি। স্টিম রোলারের মতো নির্বিকার চিত্তেই তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আর দক্ষিণ কোরিয়ার গোলাভিমুখে গড়িয়ে গেলেন। গড়াতে গড়াতে গোলও করেছেন। গুরুর প্রত্যয়কে উপযুক্ত শিক্ষার্থী এমনি করেই অটুট রেখে দিয়েছিলেন সেদিন।

আরও বিপ্লবাত্মক রীতি কোচ রহিম অনুসরণ করেছিলেন জাকার্তায়। মূল ফাইনালে পি বর্মণের জায়গায় খেলিয়েছিলেন গোলরক্ষক থঙ্গরাজকে। বর্মণ আগাগোড়াই ভাল খেলছিলেন। ফাইনালে তাঁকে বাদ দেবার কথা অধিনায়ক চুনী গোস্বামী, প্রাক্তন অধিনায়ক প্রদীপ ব্যানার্জি এবং অন্য কারুর মনেই উঁকি দেয় নি। শুধু রহিম সাহেবের ছাড়া।

থঙ্গরাজকে তাঁর প্রয়োজন, তাই তিনি তাঁকে ফাইনালে খেলিয়েছিলেন। সেই ফাইনালে থঙ্গরাজের ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে রহিম সাহেবকে জবাবদিহি করতে হোতো। কিন্তু তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। সমালোচনার উত্তর দিতে তিনি ছিলেন সদাই প্রস্তুত। প্রকাশ্যেই বলতেন, নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা যখন করছি তখন দেবার মত কৈফিয়ৎ আমার আছে বৈকি।

সমালোচনাকে তিনি ভয় পেতেন না। বরং সৎ সমালোচনাকে তিনি স্বাগত জানাতেন। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্য বলতেন, সমালোচনা তাঁরাই করুন যাঁরা খেলা বোঝেন ও জানেন। একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে।

সেদিন কলকাতার এক হোটেলে বসে আছি। সামনে জনাব রহিম। তখনও আমাদের দেশে চার ব্যাকে খেলার ঢেউ আসে নি। ৪+২+৪ ক্রীড়ারীতি তখনও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই নি। এই নব ক্রীড়া পদ্ধতি সম্পর্কে মনের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল। বুঝে নেবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলাম,

আচ্ছা ৪+২+৪ বা চারব্যাক, দুই হাফ ব্যাক ও চার ফরোয়ার্ডে খেলার ধরনটি ঠিক কি রকম? একেবারে গোড়া থেকেই কি চারজনকে ব্যাক হিসেবে দাঁড় করানো হয়? না চাপের মুখে কোনো হাফ ব্যাক বাড়তি বা চতুর্থ ব্যাকের ভূমিকা নেন?'

উত্তর পেলাম, দু ভাবেই চারব্যাক প্রথা অনুসরণ করা যায়।

তা'হলে কোন্ হাফ ব্যাক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পিছিয়ে পড়বে ? আমি শুধালাম।

কেন ? যে দিক দিয়ে অপর পক্ষ আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিপরীত প্রান্তের হাফ ব্যাককে পত্রপাঠ পিছিয়ে দাঁড়াতে হবে। কারণ তখন তারই ফুরসুৎ।

তারপরই উত্তর ছেড়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি নিজে বোধহয় খেলতেন, না ? দেখুন, আমাদের দেশের সাংবাদিকদের যদি টেক্‌নিক সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকে তাহলে কোচের কাজ সহজ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমরা যেমন সাংবাদিকদের বোঝাতে পারি তাঁরাও তেমনি পারেন দেশকে বোঝাতে। আর সাংবাদিক, সমালোচকদের ধারণা যদি অস্পষ্ট থাকে তাহলে বোঝাবুঝির বদলে ভুল বোঝারই বোঝা বাড়ে না কি ?

শুনে মনে হয়েছিল, কোথায় যেন রহিম সাহেবের সুপ্ত অভিমান রয়েছে।

শেষ জীবনে পাতিয়ালার ক্রীড়া শিক্ষণ পরিষদে আমাদের দেশের ব্যবস্থা যখন জাতীয় কোচকে এক অল্পখ্যাত বিদেশী কোচের কাছে সাধারণ শিক্ষার্থীর মতো পাঠগ্রহণে বাধ্য করেছিল তখনই সম্ভবতঃ রহিম সাহেব মনে মনে আহত হয়েছিলেন। কাজটা সত্যিই ভাল হয় নি। জাতীয় কোচকে আমরা কি নজরে দেখে থাকি এক বিদেশী সেকথা জেনে ফেল্লেন। এতে আর যাই হোক জাতীয় মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধের প্রশ্নটি বড় করে তুলে ধরা হয় নি নিশ্চয়ই।

আজীবন শিক্ষকতা করেছেন জনাব এস এ রহিম। প্রথম জীবনে স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক। উত্তরপর্বে ফুটবল কোচ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে হায়দ্রাবাদের ক্রীড়ামানকে উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত কৃতিত্বই তাঁর।

শিক্ষকের মহান চরিত্রোপযোগী অনেক সদগুণেই ছিল তাঁর

অধিকার। ছোটখাটো মানুষটির ব্যক্তিত্ব ছিল অসামান্য। শিক্ষার্থীদের যেমন তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, তেমনি সমীহ আদায় করার উপায়ও জানতেন। গুরুশিষ্যে সহজ ও মধুর সম্পর্ক ছিল বলেই ওঁরা একদিন বেহিসেবী কর্মকর্তাদের খামখেয়ালীর জবাব দিতে পেরেছিলেন।

ঘটনাটি আমাদের দেশের খেলাধূলার ক্ষেত্রে এক ইতিহাস হয়ে আছে, যদিও সে কাহিনী হয়তো অনেকের জানা নেই।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫৯ সালে কোয়ালালামপুরে মারডেকা প্রতিযোগিতা অন্তে ভারতীয় দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে। দলের সঙ্গে ফিরছেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তদানীন্তন সভাপতি ও সহ-সভাপতি। ওঁরা খেলোয়াড়দের সুবিধে অসুবিধে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে না চেয়ে টাকার অঙ্কটি ভাল করে বুঝতে চাইছিলেন।

তাই অর্থ সংগ্রহে কর্মকর্তা দুজন দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় দলের কয়েকটি প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে ফেললেন। পরপর অনেক খেলা। রহিম সাহেব বল্লেন, এতো পরিশ্রম কি ছেলেদের ধাতে সইবে ?

কিন্তু কর্মকর্তারা কানে তুল্লেন না সে কথা। হুকুম চালাতে অভ্যস্ত তাঁরা। হুকুমেই ভারতীয় দলটিকে পরপর পাঁচদিন খেলতে বাধ্য করলেন। পঞ্চম দিনে ভারতীয় দল ভিয়েৎনামের কাছে ১—৫ গোলে হারলো। সেই সঙ্গে অবসাদে, আঘাতে অস্থির জনকয়েক ভারতীয় খেলোয়াড়ও এলিয়ে পড়লেন।

জনাব রহিম এতোদিন শুধু প্রতিবাদই করছিলেন। এবার পুরোপুরি বেঁকে বসলেন। কর্মকর্তাদের বল্লেন, আর খেলা নয়, এবার বাড়ী ফিরতে হবে।

সেকি ? আমরা যে কালকেই একটা খেলার ব্যবস্থা করেছি, কর্মকর্তারা চমকে উঠে বল্লেন।

'ব্যবস্থা পাল্টে দিন। ছেলেরা মেসিন নয়।' রহিমের স্বর ভারী। কর্মকর্তারা এবার অসুবিধা বোধ করলেন। তারপর বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, তাঁদের কৃপাতেই রহিম আজ কোচের পদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং অমান্য করলে ফল ভাল হবে না কিন্তু।

তবু রহিম অমান্যই করলেন। হেসে জবাব দিলেন, 'পশুক্লেশ নিবারণে আজকাল প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। আপনারা কি তাও জানেন না? মানুষের প্রতিও কি আপনাদের কোনো সহানুভূতি নেই?'

ওঁদের না থাক। রহিম সাহেবের ছিল। তাই দূরপ্রাচ্যে প্রস্তাবিত ষষ্ঠ ম্যাচটি আর অনুষ্ঠিত হয় নি। জাতীয় ফুটবল দলের ক্ষণিক বিদ্রোহ সেদিন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

আরও একদিন আমি স্বাধীনচেতা জনাব রহিমকে এমনি নির্ভীক হয়ে উঠতে দেখেছি।

সেদিন কলকাতার ওলিম্পিকের বাছাই পর্বে ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার খেলা। বিরতির সময় ভারতীয় ফেডারেশনের তদানীন্তন কর্ণধার ভারতীয় খেলোয়াড়দের অযাচিত উপদেশ দিতে এগোলেন। কখনো বা কৈফিয়ৎ নেওয়ার সুরে ধমকে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন রহিম, 'এখন কোনো কথা নয়। ওরা পরিশ্রমে কাতর। ওদের উত্যক্ত করবেন না। আর ওরা খেলছে আমার নির্দেশে। কিছু বলার থাকলে আমায় বলবেন। তবে এখন নয়। পরে। আপনি এখন যান।'

কড়া কথা! মুখ কালি করে সরে গেলেন জাঁদরেল কর্মকর্তাটি!

যাঁরা মাঠের মধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কসরৎ করেন তাঁরা যে খেলার সময় অযাচিত উপদেশ পছন্দ করেন না একথা রহিম সাহেব বুঝতেন। কারণ খেলোয়াড়ের মন তাঁরও ছিল। যৌবনে তিনি নিজেও ফুটবল খেলেছেন ইনসাইড ফরোয়ার্ডরূপে। খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন। তাই খেলার মধ্যে তিনি বিশেষ

কোনো উপদেশ দিতেন না। যা বলার বলতেন পরে যখন ঠাণ্ডা মেজাজে বোঝাবুঝির অবকাশ থাকতো অপর্যাপ্ত।

আর একটি কাজ রহিম সাহেব কখনো করতেন না। চাইতেন না নিজেকে জাহির করতে। এ বিষয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনীহা।

মাঠের মধ্যে হাত পা উঁচিয়ে সতীর্থ বা রেফারীর কাজের সমালোচনা যে খেলোয়াড়েরা করে থাকেন তাঁদের উদ্দেশে কতোবার রহিমকে বলতে শুনেছি,

'কেয়া বাৎলাতা? কিস্‌কো বাৎলাতা? বাৎলানেওয়ালা তুম কোন্ হ্যায়?'

ভারী খাঁটি কথা! শিক্ষার কথাও। তবুও আফ্‌শোস্, রহিম শিষ্যদের কেউ কেউ এখনও মাঠের মধ্যে বাৎলানোর বদভ্যাস ছাড়তে পারেন নি! দৃষ্টান্ত? কলকাতার মাঠেই ছড়ানো রয়েছে। নাম ক'টি আমি নাই বা করলাম।

১৯৫২ সালে জনাব রহিম ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার মুহূর্তে হেলসিঙ্কিতে ভারতকে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল ১—১০ গোলের ব্যবধানে। চার বছর পর রহিম নির্দেশিত তিনব্যাক প্রথায় খেলে মেলবোর্ণে ভারত অষ্ট্রেলিয়াকে হারায় ৪-২ গোলে এবং সেমিফাইনালে সেই যুগোশ্লাভিয়ার কাছে হারে ১-৪ গোলে। পরবর্তী ওলিম্পিয়াডে রোমে ভারত বনাম ফ্রান্সের খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে এবং ভারত হাঙ্গেরীর কাছে পরাজিত হয় ২-১ গোলে ও পেরুর কাছে ৩-১ গোলে।

ডজন ডজন গোলে হেরে যাওয়ার পথ তিনি আগলে দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। রক্ষণব্যূহ গড়ার পর সার্থক আক্রমণ রচনার সূত্রও খুঁজে পেয়েছিলেন জাকার্তায়। শক্ত হাতে ভিৎ গড়ে সবে তিনি রচনাত্মক পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন। এমনি সময়ে

এই বিয়োগ বিপর্যয়! কে জানে, এই ধাক্কা সামলাতে কতোদিন লাগে!

তবে আশার কথা এই যে রহিম শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ আজ কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। পারলে তাঁরাই পারবেন পরলোকগত গুরুর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতে।

জনাব রহিমের জীবনাবসানে ভারতীয় ফুটবলের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে সে ফাঁক পূরণে রহিম শিষ্যদের ওপর আজ বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে। রহিম সাহেব হায়দরাবাদে একটি ফুটবল শিক্ষায়তনও গড়ে দিয়েছেন। সে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার কর্তব্যও শিষ্যদের। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওঁরা যেন অবহিত থাকতে পারেন। জনাব রহিমের অবর্তমানে ভারতবর্ষের ফুটবল আজ ওঁদেরই মুখ চেয়ে রয়েছে।

অন্য আসরে

এবার অন্য এক আসরের কথা।

এ আসর দু শরিকের লড়াই বা গোলাপের যুদ্ধ ঘিরেও নয়! একেবারে অন্য আয়োজন, যে আয়োজনে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলো মোহনবাগান আর ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

ফুটবল দলগত খেলা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে দলগত খেলা উপলক্ষেই কখনো কখনো ব্যক্তি বিশেষ দলকে ডিঙ্গিয়ে নিজেকে তুলে ধরেন উর্দ্ধে। তখন দল থাকলেও দলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ব্যক্তি বিশেষরই ভূমিকায়। কথাগুলি মনে পড়লো অন্য আসরে এসে। মনে করিয়ে দিলেন অশোক চ্যাটার্জি।

বাহাদুর ছেলে অশোক চ্যাটার্জি। সারাক্ষণ তিনি আর কি করেছেন মনে পড়ে না। কিন্তু কাজের কাজ করে তুলতে শনিবার ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে অশোকের কোনো জুড়ি ছিল না।

গোল প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অনেকখানি। আর সেই গোলেই অশোকের মহিমা প্রতিভাত। একবার নয়। দু দুবার। এতোটুকু আকৃতি অশোক চ্যাটার্জির। কিন্তু শনিবারে অপরাহ্নে এক বিক্ষিপ্ত লগ্নে অশোকের অস্তিত্ব এতোখানি হয়ে সারা মাঠ জুড়ে বসেছিল।

ক্ষণ দ্বিতীয়ার্ধের ত্রয়োদশ মিনিট। তিনব্যাকে সাজানো রেলের রক্ষণব্যবস্থা তখন বুঝি আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্য কথা ভাবছে। না, ঝিমোচ্ছে! হঠাৎ দুলাল মণ্ডল সেই অপ্রস্তুতির ফাঁক গলিয়ে বল পাঠালেন অরুময়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অরুময়ও সেণ্টার করলেন। খুব উঁচু পথে নয় কিন্তু জোরালো সটে। কোথায়

ছিলেন অশোক! কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হেড করলেন। বলে-মাথায় হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোল!

রেলের স্টপার তাঁর নির্দিষ্ট অঞ্চলে ফিরে আসার, রেলের গোল রক্ষক কিছু করে ওঠার অনেক আগেই পরাজয়ের নিশ্চিত চিহ্নে ইস্টার্ণ রেলের কপাল কালো হয়ে উঠলো। রেলের কপাল সুনিশ্চিতভাবে ভাঙ্গলো বটে কিন্তু ফুটবল অনুরাগীদের মন অপরূপ খুশীর আলোয় ঝলমল করে উঠলো। হ্যাঁ, একেই বলে গোলের মত গোল! প্রথম গোলও করেছিলেন অশোক। কিন্তু দ্বিতীয়টির পাশে তা মানানসই নয়। কোনো তুলনাই চলে না।

এই গোলটিই শনিবারের বড় খেলার সেরা সঞ্চয়। তাই ওটির উল্লেখ আগেই রাখলাম। এখন বাকী কথায় আসি।

মোহনবাগান আর ইস্টার্ণ রেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘিরে কলকাতার ফুটবল মহলে যে প্রত্যাশা উচিয়ে ছিল সে প্রত্যাশা শনিবারের অপরাহ্নে কিছুটা মিটেছে। কিন্তু সবটুকু নয়। দু তরফই পরস্পরকে সমঝে বুঝে চলার পরিকল্পনা এঁটেছিল। তাই বেশীর ভাগ সময়েই খেলার গতি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছে। ভুল পাশ বা মিস্ পাশের অভিশাপও সময়ে সময়ে ছন্দপতন ঘটিয়েছে। বাঁধা ছক মানতে গিয়ে রেলকর্মীরা এক এক সময় মুখস্থ বিদ্যা আউড়েছেন। চোখ বন্ধ রেখে বল পাওয়া মাত্র তা সতীর্থের উদ্দেশে ঠেলেছেন। কোন সতীর্থ জায়গায় আছেন বা এলেন কিনা কেই বা তার হিসেব রাখেন! তাই ইস্টার্ণ রেলের আদ্যাশক্তির স্থিতি যেখানে সেই ফরোয়ার্ড লাইন গড়গড়িয়ে ছুটতে পারে নি।

বোঝাপাড়ার ভিত্তিতে তেমন আদর্শ পথে মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনও নড়তে পারে নি। তবু মোহনবাগানের সান্ত্বনা, ওঁৎপাতা শিকারীর মতো সুযোগে ছোঁ মারতে অশোক চ্যাটার্জি প্রস্তুত ছিলেন। আর ছিলেন দু প্রান্তের উইং ফরোয়ার্ড অরুময়

ও দুলাল মণ্ডল। এই দুজনে মুখস্থ প্রথা প্রকরণের পায়ে নিজেদের বিলিয়ে দেন নি। তাঁদের মূলধন ব্যক্তিগত দক্ষতা। তারই ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রথা প্রকরণের ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছেন।

ফুটবল দলগত খেলা, মানি। কিন্তু একথা জানি যে দলগত সংহতির সুষ্ঠু বিন্যাসে ব্যক্তিগত দক্ষতাই সবচেয়ে বেশী কাজ করে। একক দক্ষতা জলাঞ্জলি দিয়ে দলগত দক্ষতা বাড়ান যায় না। দক্ষতায় ও যোগ্যতায় অরুময় ও দুলাল নিজেদের বিশিষ্টরূপে গড়তে পেরেছিলেন বলেই শনিবাবের খেলায় তাঁরাই ছিলেন উপযুক্ত ফরোয়ার্ডের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। এ সামর্থ ওপ্রান্তে প্রদীপ ব্যানার্জিরও ছিল। কিন্তু শনিবারের প্রদীপের শিখা এ বছরের অন্য অনেক খেলার অনুপাতে যেন নিবু নিবু। তবে তাঁর আর অপরাধ কি! বল ঠেলে বল যদি সময়ে এবং ঠিক জায়গায় ফেরৎ না পান তাহলে তিনি আর কি করতে পারেন? একা প্রদীপ ব্যানার্জি তো আর পুরো ইস্টার্ণ রেল দল নন।

মাঠের মাঝখানে সবচেয়ে জোরদার খুঁটি ছিলেন মোহনবাগানের বিদ্যুৎ মজুমদার। তাঁর সক্রিয়তায়ও টান্ পড়েনি বিশেষ। এগিয়ে গিয়ে বারদুয়েক রেলের গোলরক্ষককে পরখ করতেও তাঁর কুণ্ঠা জাগে নি। রেলের কালন গুহ অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে সুরু করেছিলেন। কিন্তু সময় ফুরোবার মুখে তিনিও যেন ফুরিয়ে যান। জার্নেল আস্থার প্রতীক, বীরেন গুহও শক্ত প্রতিরোধে মোটামুটি সমর্থ। কিন্তু পি, বর্মণের অবস্থা অমন নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল কেন? একবার নয়, বারকয়েক তাঁর হাত থেকে বল ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর অনিশ্চয়তায় হঠাৎ পাওয়া সুযোগগুলি যে রেলের ফরোয়ার্ডেরা সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি, তার জন্যে বর্মণের আর মোহনবাগানেরই ভাগ্যের দোহাই পাড়তেই হবে।

প্রথম গোল হয় প্রথমার্ধের উনিশ মিনিটের মাথায়। অরুময় ব্যাকপাশ করলেন আর রেলের একগাদা খেলোয়াড়কে তৎপরতায় টেক্কা দিয়ে অশোক চ্যাটার্জি বলটি গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন। এই গোল করতে মোহনবাগান একটু বেশী সময় নেয়। গোল আগেই হোতো যদি না ন মিনিটের মাথায় চুণী গোস্বামী ত্বলাল মণ্ডলের সাজানো ব্যাক পাশটি আলতোভাবে গোলরক্ষক এন মণ্ডলের হাতে ঠেলে দিতেন।

এতোক্ষণ ইস্টার্ণ রেল যেন হাত গুটিয়ে বসেছিল। কিন্তু গোলের ঝাঁঝে এবার তাঁরাও চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে রেলের চাপ প্রসারিত হলো। সে চাপে বিত্যুৎ, জার্নেল পর্যন্ত নড়ে উঠলেন। মোহনবাগানের রক্ষণ ব্যবস্থা যেন থরথরিয়ে উঠেছে আর কর্ণারের পর কর্ণার এবং আবার কর্ণার আদায় করে রেলদল শোধ দেবার সংকল্পে ফুঁসছে। মাত্র নিনিট কয়েকের ফোঁস-ফোঁসানি! তবুও তার অস্থিরতায় সারা মাঠে গেল গেল রব উঠেছিল।

সত্যিই, গিয়েছিল আর একটু হলেই! কি করে যে এই মুহূর্তে গোলের রাস্তায় খিল্ আঁটতে পেরেছিলেন তা বুঝি মোহন-বাগানের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরাও জানেন না! দেবনাথ একবার গোল লাইন থেকে বল সরিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তে আর একধাপ আগে পা রেখে তিনিই রেলের আর এক প্রয়াসকে বাধা দিলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এরপরও রেলের ফরোয়ার্ডদের সট পায়ে লেগে ঠিকরে এসেছে। খেলায় যাঁরা ভাগ্য মানেন না, তাঁরাও বুঝি ওই মুহূর্তে মোহনবাগানের সেই ভাগ্য আর রেলের ত্বর্ভাগ্যের চেহারা দেখে অবাক হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তর পর্বে দ্বিতীয়ার্ধের বাকী সময়ে ইস্টার্ণ রেলওয়ে আর তেমন ভাবে হাতিয়ার শানাতে পারে নি। খেলা চালিয়ে গিয়েছে,

এই পর্যন্তই। শোধ নেবার সাধু সংকল্পে জান্ মান্ কবুল করে নিষ্ঠায় ও উদ্যমে নিজেকে বিলিয়ে দিতেও পারে নি। বরং দ্বিতীয়-পর্বের মাঝামাঝি মোহনবাগানই আবার গোলের সামনে আক্রমনাত্মক মেজাজে ফিরে এসে অশোক চ্যাটার্জিকে দিয়ে একটি উপভোগ্য মুহূর্ত গড়ে তুলতে পেরেছে। খেলা যখন ফুরিয়ে গেল তখনও সেই মুহূর্তের উষ্ণতা চারিদিকে ছড়ানো।

ক্রিকেটের নন্দনকাননে

সাল ১৯৬৭। তারিখ ১৮ জুন। সময় অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা।

লগ্নটি মনে থাকবেই। কারণ, ওই লগ্নে ইডেনে নতুন ইতিহাস লেখা হয়েছিল। তবে সে ইতিহাস ঐতিহ্য অনুসারী নয়। সে ইতিহাস ব্যতিক্রমের। ক্রিকেটের নন্দনকাননে ওই মুহূর্তে ফুটবলের পদচিহ্ন আঁকা হয়েছিল। শতাধিক বর্ষের ক্রিকেট ঐতিহ্যে গরবিণী ইডেনের আজ অন্য মেজাজ!

এ মেজাজে ক্রিকেটের শান্ত, ভব্য, স্নিগ্ধতার ছায়া নেই। নেই শীতের দুপুরের মুঠোমুঠো রোদ্দুরের হেমকান্তি। ব্যাটে-বলে ঠুকঠাক, ঠকাঠক্ শব্দ ঘিরে ক্রিকেট সঙ্গীতের মুর্ছনাও অশ্রুত। বিকল্পে ফুটবলের তারস্বর। উত্তেজনা মাখানো সক্রিয়তা ঘিরে প্রতিমুহূর্তের দাপাদাপি। হাততালির জলতরঙ্গ কোথায় গেল! মুহুর্মুহু অস্ফুট আহা, উঁহুতে জড়িয়ে থাকা সেই আবেগই বা কোথায়?

ক্রিকেটের নন্দনকাননে ফুটবলের উত্তেজনা সিং বাগিয়ে ঢুকে পড়েছে। সিংয়ের গুঁতোয় ঐতিহ্যের নাভিশ্বাস উঠলো!

উঠলো তো পৃথিবী রসাতলে গেল নাকি? ফুটবল প্রেমিক তাঁর ক্রিকেট অনুরাগী বন্ধুকে খেঁকিয়ে তাড়া দিলেন। ঐতিহ্য, ঐতিহ্য করেই তোরা হেদিয়ে মর। কি হবে ঠুনকো ঐতিহ্যের বড়াই করে?

ঐতিহ্য বড়, না প্রয়োজন বড়? সত্যি করে বল দেখি। এই যে এতগুলো মানুষ আজ মনোরম আঙিনায় হাত-পা ছড়িয়ে খেলা দেখতে পাচ্ছে, তার দাম কি তোদের ক্রিকেটের ঐতিহ্যের চেয়ে কম নাকি? পাকা স্টেডিয়াম যখন নেই তখন এই ব্যবস্থাই

তো ভাল। তাছাড়া কাজেই যদি না লাগে তো এতোবড় একটা মাঠ থাকা, না থাকা, তুই কি সমান নয় ?

ফুটবল প্রেমিক বড় গলায় বলে চলেছিলেন, এক মাঠে কি তু মরশুমে ফুটবল আর ক্রিকেট চলতে পারে না ? মেলবোর্ণে চলেছে। ওখানেও যদি চলে, এখানেই বা চলবে না কেন ?

ক্রিকেট অনুরাগী বন্ধুটি ফুটবলের এই ধমকের জবাবে মিন্‌মিন্‌ করে কি যে বলেছিলেন তা আমি শুনতে পাই নি। তবু মনে হচ্ছিল যে ওই ক্রিকেট প্রেমিকের মনের তারে ওই মুহূর্তে যে রাগিণী বাজছিল তা ভারী করুণ, বিষণ্ণ। বোল্‌ তার অনুচ্চারিত প্রায়।

ওই গ্যালারি ভর্তি দর্শক আর ফুটবলের নর্তন-কুর্দনের জাঁহাবাজ অস্তিত্বে সে বিষণ্ণতা চাপা পড়ে গেলেও একেবারে হারিয়ে যায় নি নিশ্চয়ই। শাক্‌ দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না, তেমনি ঝাঁঝাঁলো কণ্ঠের হট্টগোলেও ঐতিহ্য, আবেগকে অস্বীকার করা যায় না। যায় কি ?

প্রয়োজন বড়ো কথা, মানি। কলকাতার ব্যর্থ ক্রীড়া সংগঠকেরা এতোদিনে মহানগরীকে একটি বড়সড় ফুটবল স্টেডিয়াম উপহার দিতে পারেন নি। জনসাধারণের ফুটবল প্রীতিকে মূলধন হিসেবে খাটিয়ে তাঁরা যে ফলাও ব্যবসা ফেঁদেছেন তাতে লাভের অঙ্ক ফুলে ফেঁপেছে। কিন্তু দর্শকদের ভোগান্তি কমে নি। জনতার তুর্ভোগের অশ্রুসজল কাহিনী শুনেও ওদিকে নির্বিকার সরকারের পাষাণ হৃদয় টলে নি।

তাই স্টেডিয়াম বিহীন কলকাতাতে বাড়তি চাহিদা মেটাতেই আজ ফুটবল স্থানান্তরিত হলো ক্রিকেটের নন্দনকাননে। কে অস্বীকার করবে, নতুন ব্যবস্থায় জনজীবনের প্রয়োজন মেটে নি ?

কিন্তু প্রয়োজনই কি সব ? এবং ঐতিহ্যের কোনো মূল্য নেই ? তা যদি না থাকে তাহলে পুরাকালের স্থাপত্য, শিল্প-

কর্মের নিদর্শনগুলি একালে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখায় তোড়জোড় কেন? মর্মর প্রাসাদ তাজমহলকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কেন তবে আজ সেখানে সারি সারি ব্যারাক বাড়ী বানানো হচ্ছে না? ব্যারাক গড়লে তো বাসার টানাটানির যুগে একালে অনেক নাগরিক সেখানে মাথা গুঁজে দিন কাটাতে পারেন।

আর এক মাঠে দু মরশুমে দু ধরণের খেলার আয়োজন ঘটানোর প্রস্তাব? সে প্রস্তাব অযৌক্তিক নয়। যদি অবশ্য দু মরশুমের ফাঁকে হাতে সময় রেখে মাঠটিকে ঢেলে সাজাতে কোমর কষে বাঁধা হয়। কিন্তু তবু কথা থেকে যায়।

যে দেশে এক মাঠেই ক্রিকেট ও ফুটবল চলে এ মরশুমে, ও মরশুমে সে দেশেও কিন্তু কেউ বলে না যে লর্ডসে ফুটবলের আসর পাতা হোক। এই তো সেদিন ইংলণ্ডে জুলে রিমে কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। কিন্তু কই, সে উপলক্ষে লর্ডস তো দূরে থাকুক, অন্য কোনো ক্রিকেট মাঠ নিয়ে তো টানাহ্যাঁচড়া করা হোলো না? ইংলণ্ডে উপযুক্ত ফুটবল মাঠ অগুন্তি আছে বলেই যে লর্ডস বা অন্য ক্রিকেট মাঠ রেহাই পেয়েছে তাও নয়। না থাকলেও লর্ডসের জমিতে ফুটবল বুটের লাঙ্গল চালানো হোতো না।

লর্ডস মাঠে ক্রিকেট, উইম্বলেডনে টেনিস ছাড়া অন্য কোনো খেলা হওয়ার কথা ইংলণ্ডের কেউ স্বপ্নেও আনতে পারে না। কারণ, ইংলণ্ড জানে যে ভাঙ্গতে না লাগলেও, ঐতিহ্য গড়তে অনেক সময় লাগে। কোনো একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ মাঠের স্বাতন্ত্র্য গড়তে কাঠখড় পোড়াতে হয় অনেক। কিন্তু আমরা কি এসব কথা ভাবি? ভাবি না বলেই গোঁজামিলের পথে পা মেলে দিই। তাই ইডেনের ঐতিহ্য ভুলতে আমাদের সময় লাগে না। প্রস্তাবটা বুকে তীরের মতো বেঁধেও না!

রাণী রাসমণি না কোচবিহারাধিপতি, ইডেনের মালিক ছিলেন

কে? এই প্রশ্নে অস্পষ্ট ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ঘাঁটাঘাটি না করেও বলা যায় যে ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেনের প্রতিষ্ঠা ১৮৬৪ সালে। সেই থেকেই ইডেন বলতে এতোদিন ক্রিকেটের নন্দন কাননকেই বোঝাতো। এর চেয়ে প্রাচীন ক্রিকেট মাঠ সারা বিশ্বে আর একটি মাত্র আছে।

ইংলণ্ডীয় ক্রিকেট বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লর্ডস মাঠের যে মর্যাদা ভারতীয় ক্রিকেটে এতোদিন ইডেনের সেই মর্যাদা ছিল। ইডেন খানদানী ক্রিকেট মাঠ, উট্‌কো বিত্তবান ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়াম নয়। তবে আজ থেকে পাঁচমিশালী খেলার সর্বার্থক আঙিনার নামাবলী চড়লো ইডেনের অঙ্গে। এই নামাবলীর দৌলতে ইডেনের অঙ্গহানি না ঘটে!

আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। যেহেতু ফুটবলের অনুপ্রবেশের আগেই ইডেনের চেহারা ও চরিত্র বদলাতে শুরু করে দিয়েছিল। কে জানে এরপর কি ঘটবে!

বদলে যাওয়া কালে সেই সাবেক আমলের শ্রী বিগত। সারা মাঠ ঘিরে সারি সারি দেবদারু দাঁড়িয়েছিল। সেগুলো যেতে বসেছে কাঠুরের হাতের নিষ্ঠুর কোপে। পূব-উত্তরে দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে সিমেণ্টের একটি কাঠামো! সম্প্রতি বৃত্তাকারে পাকা গ্যালারি বসানো হয়েছে।

পাকা গ্যালারি বা পাকা স্টেডিয়ামে কারুরই আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি বৃক্ষ হননে। বন সম্পদকে বাঁচিয়ে কি স্টেডিয়াম গ্যালারি গড়া যেত না? যেতো নিশ্চয়ই যদি আমাদের সৌন্দর্য-বোধ, রুচিবোধ থাকতো। কিন্তু রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে যে আমরা বেনিয়া বুদ্ধির পায়ে জলাঞ্জলী দিয়ে বসে আছি। মাঠ থেকে আঁচল ভরে টাকা পয়সা তুলে নেওয়ার ফিকিরে ইডেনের নয়নানন্দ প্যাভিলিয়নটিকে কবে আমারা চোখের আড়াল করে ফেলেছি!

বড় খেলার দিন ইডেনে যান তো দেখবেন যে সেখানে প্যাভিলিয়ন বলে কিছু নেই। কার্যতঃ থাকলেও, দৃশ্যতঃ নেই। প্যাভিলিয়নের সামনে কাঠের পাটাতন বসিয়ে গ্যালারি গড়া। এবং সেই গ্যালারির ছাদ ও পাশ দৃষ্টিকটু চট দিয়ে মোড়া। এই চটের বাহার দেখতে দেখতে রুচিবোধের পিলে পর্য্যন্ত চমকে যায়।

সে আমলে ইডেন কেমন ছিল ?

দেখতে চান তো চলুন এক মুহূর্তের জন্যে পুরাণো দিনে ফিরে যাই।

যেই ফিরলেন সাবেক আমলের ক্রিকেট উদ্যান ইডেনে অমনি চার পাশের সবুজের সমারোহে আপনার চোখ জুড়িয়ে গেল। পায়ের নীচে নরম দুর্বাঘাসের সবুজ মখমল বিছানো। চারপাশে মাথাতোলা দেবদারু, ঝাউয়ের বেষ্টনী। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, কখনো এলোমেলো ঝাপটার সোঁ সোঁ আওয়াজ। সামনে প্যাভিলিয়ন, অভিজাত আঙ্গিকের শিল্পকর্ম। আর ঠিক তার পাশেই এক খড়ো চালার ছাউনী।

সব মিলিয়ে ইডেনের এই ছবি পল্লী শ্রীরই প্রতীক। শহুরে জৌলুসের সঙ্গে তার এতোটুকু মিল নেই। কিছুক্ষণ থাকলেই মনে হোতো যে নগরজীবনের ব্যস্ত সমস্ত কোলাহলের বাইরে এসে প্রকৃতির কোল্ পেয়েছি।

কিন্তু কোল্ দেওয়া সে প্রকৃতি আজ কোথায় গেল! সবুজ কার্পেটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অগুন্তি ক্ষত চিহ্নই বা কেন ? জলের মতো টাকা ঢালা হচ্ছে, তবু আশ্চর্য, ঘাসগুলোকে পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না! ফুটবল খেললেই মাঠ নষ্ট হবে এ কথায় যাঁদের সায় নেই তাঁরা অবশ্যই বলতে পারেন যে না খেলেও তো ইডেনের এই হাল হয়েছে। অতএব ফুটবলে আপত্তি কেন ?

তাঁদের কথায় যুক্তি আছে। তবু বলি, আবেগ আর ঐতিহ্য সচেতনা কি যুক্তির হাত ধরে চলে ? যুক্তি মানলে ইডেনে ভীড়

জমানো যায়, কিন্তু ক্রিকেট মাঠের স্বাতন্ত্র্য বাঁচানো যায় না। যাচ্ছে না। যাবেও না।

লর্ড হক্, রনজি, হব্স, ম্যাকারটনি, ট্যারেণ্ট, ওরেল, সোবার্স, বেনো, হার্ভে, নাইডু, অমরসিং, মার্চেণ্ট, শতাব্দীর সেরা ক্রিকেটারদের কীর্তি কাহিনীর স্বাক্ষর ধরে রেখেছে এই ইডেন। এর বাতাসে ক্রিকেট, নিঃশ্বাসে ক্রিকেট। পরিপার্শ্বে ক্রিকেট কল্লোল। ইডেনের খণ্ড ইতিহাস অখণ্ড হয়ে উঠতো যদি কোনদিন এখানে অবিস্মরণীয় ডন ব্রাডম্যানের আবির্ভাব ঘটতো। কিন্তু কি আফশোষ, তা আর হলো কই!

ইডেনে ডনের অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ হয় বৈকি। কিন্তু তা বলে হতাশ হওয়ার হেতু নেই। ডন ছাড়া আর যাঁরা ইডেনে এসেছেন তাঁরাও অনেকে ক্রিকেটের ইতিহাস স্বীকৃত পুরুষ।

ইডেনের বয়স পৌনে দুশো বছর হলো। ইডেন উদ্যান অঞ্চলটি গড়ে ওঠে ১৭৯২ সালে। জন্মের কিছু কালের মধ্যেই ইডেনে বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিকেট খেলা হতো। তবে নিয়মিত আসর পাতা হয় ১৮৬৪ সালে। ওই বছরে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের স্থায়ী আড্ডা প্রথম বসে ওখানে। পশ্চিম ধারে প্যাভিলিয়নটি নির্মিত হয় ১৮৭১ সালে।

ক্রিকেট মাঠ হিসেবে সারা বিশ্বে ইডেনের চেয়ে পুরানো আর মাত্র একটি মাঠই আছে, ইংলণ্ডের কেণ্টে সেভেনওক ভাইন ক্লাবের ক্রীড়াঙ্গন। কিন্তু সেভেনওক ভাইন মাঠে কোনদিন টেষ্ট খেলা হয় নি। কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচও নয়। কাজেই একদিকে প্রাচীনত্ব, অন্যদিকে টেষ্ট ক্রীড়াকেন্দ্রের মর্যাদা, এই দুয়ে মিলে ক্রিকেট মাঠ হিসেবে ইডেন অনন্য।

এই অনন্য ক্রিকেট মাঠেই পাতা হয়েছে ফুটবলের আসর।

প্রথম খেলা মোহনবাগানে মহামেডান স্পোর্টিংয়ে। জন

সমর্থিত ছুটি দল। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই ছুটি দলের কীর্তি কাহিনীর অনেক স্বাক্ষর। সবচেয়ে উজ্জ্বল স্বাক্ষর, প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগানের আই, এফ, এ শীল্ড বিজয় এবং মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ডুরাণ্ড কাপ লাভ। তাছাড়া কলকাতার ঘরোয়া আসরে এ ছুটি দলের নানান কীর্তি। কেই বা সে সব কাহিনী মুখস্থ রাখতে পারে!

আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। ইডেনের মোলায়েম মাঠে খেলাও জমবে বলে দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশ ছোয়া। কিন্তু হায়! আশা ছলনাময়ী। ইডেনে প্রথম ফুটবল কিন্তু জমে উঠতে পারলো না। ছু দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে কসুর করেন নি। জার্নেল সিং, আলতাফ, জন, জোশেফ, সবাই রক্ষণ-ব্যূহের খুঁটি। শক্ত ধাত তাঁদের। খেলা দেখতে বারে বারে ওই কথাটাই মনে পড়ে গেল।

কিন্তু ফুটবল কি শুধু রক্ষণাত্মক খেলাই? রক্ষণব্যূহের দেওয়াল ছেঁদা করে যে সৃজনশীল আক্রমণাত্মক আয়ুধ প্রতি মুহূর্তে তার কার্য্যক্ষমতাকে বুঝিয়ে দেয়, সেই মারণাস্ত্র কোথায়? বড় বড় চোখে মাঝমাঠে তাকিয়ে সে অস্ত্রের সন্ধানে ফিরছিলাম। কিন্তু দেখাই সার। সত্তর মিনিটের মেয়াদ কখন ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ইডেনের বুট চষা জমিতে একটি গোলেরও ফসল ফললো না। ইডেনে ফুটবলের প্রথম আসর বন্ধ্যা।

সারা মাঠ সেদিন ভর্তি হয় নি। তবু চওড়া গ্যালারি দর্শকে দর্শকে ঠাসা। পরিবেশ স্বস্তিদায়ক। পাশের মাঠের কাঠের ঘেরাটোপ পরা বুকচাপা আবহাওয়া এখানে নেই। হাত পা ছড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলার স্বাচ্ছন্দ্য এখানে। কিন্তু শুধু পরিবেশেই তো ফুটবলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটে না! গোল কই? গোলের জন্যেই তো খেলা। গোলেই আনন্দ। উত্তেজনা ও উত্তাপ। সেই গোল বিহনে ইডেনে প্রথম ফুটবলের লগ্ন যেন মিইয়ে

রইলো। গোল কই? গোল নেই! বলতে বলতে সারা মাঠ সেদিন বুক চাপড়াতে লাগলো!

এই গোলের রাস্তা খুঁজতে গিয়েই ভারতীয় ফুটবল অধুনা যেন গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে। তাই বছর বছর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেও জাতীয় ফুটবল উঁচু মানে উঠতে পারছে না। মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং, ওরাও তো ভারতীয় ফুটবলের দুটি শক্ত বাহু। জাতীয় ফুটবলের সমস্যা যা, অবিকল সেই সমস্যাতেই ওরাও ভারাক্রান্ত। ভাবি, এই দুর্বহ ভার হাল্‌কা করার মন্ত্র কতদিনে আমরা মুখস্থ করতে শিখবো?

শেষটুকু শোনা হলো না!

শুনে আমরা সবাই বুক চাপড়িয়েছি।

মন্দভাগ্য, জীবনহরি শর্মা। ইস্টার্ন রেল গোল করেছে শুনেই মূর্চ্ছা। তারপরই সব শেষ! আরও কিছুক্ষণ যদি সবুর সইতো তাহলে এতোবড় বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটতো না। একগোলে পিছিয়ে থাকার পরেও খেলাটিতে ইস্টবেঙ্গলই জিতেছে। কিন্তু জীবনহরি তা জানার অপেক্ষা করতে পারেন নি। ইস্টবেঙ্গল হারছে শুনেই তাঁর চোখ কপালে লাফিয়ে ওঠে। কপাল আর কাকে বলে! হারছে আর হেরেছে, দুটিতে যে অনেক তফাৎ!

ইস্টবেঙ্গল জীবনহরি শর্মার জীবনের চেয়ে প্রিয়। প্রিয় দলের পিছু হাঁটা ভাবটি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। না পারারই কথা। তাই বলে জীবন দিতে হবে? জানি না, জীবনহরি শর্মার জীবন নিয়ে আমাদের ফুটবলের কোন কল্যাণ হবে কিনা। তবে জীবনহরি একটা মর্মান্তিক নজীর হয়ে রইলেন। আর রইলেন যতো অকর্মের ধাড়ী হয়ে ওই খেলার বেতার ভাষ্যকারেরা। আচ্ছা, জীবনহরিদের মতো দল অনুরাগীদের কথা ভেবে বেতার কর্তৃপক্ষ কি কলকাতার ফুটবলের ধারা বিবরণী প্রচারের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দিতে পারেন না?

কিন্তু ঘোষকের কণ্ঠ থামলেও জীবনহরিরা মানসিক উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি পাবেন কি? ফুটবল থাকলেই হারজিত থাকবেই। খেলা খেলা হয়েই থাকবে। তার চেয়ে বেশী কিছুর মর্যাদা খেলাকে দিতে গেলেই বিপদ। সেই বিপদ বরণের করুণ ও চরম পরিণতিই হলো জীবনহরি শর্মার জীবনদান। প্রার্থনা করি, এমন দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে। আরও যদি ঘটে তাহলে ধারা

বিবরণী প্রচারের অনুষ্ঠান, মায় আসল খেলা ফুটবলের পাটও যেন উঠে যায়। খেলার চেয়ে জীবন আরও বড়। তা সে যাঁর জীবনই হোক্ না কেন।

খেলা তো ইস্টবেঙ্গলে আর ইস্টার্ন রেলেতে। কলকাতার মাঠে নতুন কোন আয়োজন নয়। মানের নিরিখে এ খেলা তুঙ্গেও উঠতে পারে নি। তবু এই খেলা ঘিরেই আমাদের দেশে একটি অশ্রুসজল দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অস্বাভাবিক ও অনন্যসাধারণ ঘটনা। তাই ওই ঘটনার নায়ক, যাঁকে ভারতবর্ষের ফুটবল খেলার ইতিহাসের এক বিচিত্র করুণ অধ্যায়ের নায়কও বলতে পারা যায়, তাঁরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি উপলক্ষটি স্মরণ করছি। নইলে শীল্ডের সেমি ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল বনাম ইস্টার্ন রেলের খেলার আলোচনায় ঢোকার প্রেরণা পেতাম না।

আকাশে যে বাণী ছড়াতে পারি নি সংক্ষিপ্ত সময় আর দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার চাপে ও টানে তাই আজ উচ্চারণ করছি দলের জন্যে জীবনদাতা জীবনহরি শর্মার ভূমিকা স্মরণে। জীবনহরির জীবনদানের নজীরে জীবনের পরম শিক্ষা যেন আমরা পাই।

ইস্টার্ন রেল গোল করেছে। শুনেই প্রচণ্ড শকে শিউরে উঠেছিলেন জীবনহরি শর্মা। সত্যিই, গোলই যতো অনিষ্টের মূল। গোলেই গণ্ডগোল। আবার গোলেই হাসি।

এক গোল হতেই সেদিন মাঠের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই পরিমল দে গোল করলেন, গোলের পর আবার গোল, অমনি ফুঁসিয়ে ওঠা মেজাজে অট্টহাসির কাঁপন জেগে উঠলো। ফুঁসতে যেমন, হাসতেও তেমনি। এও তো অনুরাগীদের কাণ্ড। জীবনহরি শর্মা এঁদের দলে না ভিড়ে নিজের স্বতন্ত্র পথে হারিয়ে গেলেন কেন?

শেষ পর্যন্ত ময়দানের মুখের হাসিটি সাধ্বীর সিঁথির সিঁদুরের মতো অক্ষয় থেকেছে। ভালই হয়েছে।

খেলা আই এফ এ শীল্ডের সেমি ফাইন্যালে। শীল্ড নক আউট প্রতিযোগিতা। ওঠানামা ব্যবস্থা বর্জিত কলকাতা লীগের মত মেকী প্রতিযোগিতা নয়। শীল্ডে হারজিতের দাম অনেক গুণ বেশি। হারলেই খতম। প্রতিযোগিতা ভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা যায় না। কাজেই খেলাটির ওপর স্বাভাবিক কারণেই গুরুত্ব এসে পড়েছিল। বলা যায়, খেলাটির গুরুত্ব বেড়েই গিয়েছিল।

বাড়তি গুরুত্বের হেতু, লীগের একটি খেলায় ইস্টার্ন রেলের হাতে লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়। একমাত্র পরাজয়। তার ওপর কদিন আগে চার চার দিন লড়াই চালিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইস্টবেঙ্গলকে জিততে হয়েছে। এই ফাঁকে নির্ভরশীল নঈম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গুরকৃপালের পায়ের চোট্ আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দৃশ্যতঃ ইস্টবেঙ্গলের সামনে অবস্থা প্রতিকূল এবং কিছুটা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিয়তাও খেলাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সব সংশয় ও অনিশ্চিয়তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছেন একা পরিমল দে।

পাতলা ফিন্‌ফিনে আকৃতির পরিমল দে'র সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। সূক্ষ্ম কাজে তার দক্ষতা অনস্বীকার্য্য। বল ধরার এবং বল ছাড়ার মোটামুটি ভাবে তিনি সিদ্ধকর্ম। ছোট ছোট ড্রিব্লিংয়েও উপযুক্ত! কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ যখন সুপরিকল্পিত, আঁটোসাটো, এবং দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন সেই বাধা ভেদ করে একাই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত যোগ্যতা পরিমলের আছে, এমন কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা চলে না। ফুটবল যে মুহূর্তে বুদ্ধির খেলা এবং যে খেলায় সূক্ষ্ম কাজের কার্যকরীতা অশেষ সেই লগ্নে পরিমলের গুণপনার শেষ নেই। কিন্তু মস্তিষ্কের ওপর দেহ যখন প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, অপরপক্ষ যখন জেতার আশা ছেড়ে নিজেদের আগলাতে রক্ষণব্যূহকে

শক্ত করে সাজিয়ে নেয় অঞ্চল ও মানুষের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, তখন কেন জানি না পরিমলের উপযুক্ততায় ঘাটতি পড়ে। হয়তো দেহগত পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম বলেই ব্যক্তিগত ক্রীড়া মানেরও এমন হেরফের ঘটে যায়।

কিন্তু এ হেন পরিমলই সেদিন একাই যেন পুরো দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এবং সেই দায়িত্ব পালনে কতখানি যোগ্যতার নির্ভেজাল পরিচয়ই না রেখেছিলেন!

একটি সটেই তিনি আসর মাতিয়ে দেন। একটি সটেই একদল জেতার কড়ি সংগ্রহ করে নেয়। একটি সটেই হাজারো মানুষ হারানিধি ফিরে পাওয়ার সান্ত্বনায় আনন্দে ফেটে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। তবুও যদি বলি ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছে পরিমলের ওই ফ্রিকিকটি তাহলেও বোধ করি সত্যের অপলাপ করা হবে না।

দ্বিতীয়ার্ধের সতেরো মিনিটে পরিমল দে ফ্রিকিক করলেন। ফ্রিকিক তো নয়, যেন ইস্টার্ণ রেলের মৃত্যুবাণ! গোল লাইন থেকে গজ পঁচিশ-ত্রিশ দূরে বল সাজানোর পর রেলের একদল খেলোয়াড় সার বেঁধে পাঁচিল তুলে দাঁড়ালেন। তাঁদের অনেক পেছনে রইলেন গোলরক্ষক প্রস্তুত হয়ে। প্রস্তুতিতে দৃশ্যতঃ ফাঁকি ছিল না। তবু রেলের রক্ষণব্যূহে ফাঁক ছিল কিছুটা। আর সেই ফাঁকেই লক্ষ্য রেখে বল ছোটালেন পরিমল দে।

বল নয়, যেন ছুটন্ত গুলী! কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখী। সামনের পাঁচিলের মাথা টপকে, গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে বলটি যখন জালের বাঁধনে আটকা পড়লো রেল দল যেন তখনই বুঝতে পারলো যে কি ঘটে গেল! তার আগে ছুটন্ত বলের গতিরোধে তাঁদের কেউ নড়ার ফুরসৎ পান নি। যখন নড়ার অবকাশ এলো তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। রেলের কপাল গুঁড়িয়েছে। আর ইস্টবেঙ্গলের কপালে জয়লক্ষ্মীর আশীর্বাদ জ্বলজ্বল করছে।

একটি সটেই পরিমল বাজীমাৎ করে দিলেন। একটি সটেই ইস্টার্ণ রেলের বুকে ত্রাসের কাঁপন জাগলো। অনুষ্ঠানকেন্দ্রে জেগে উঠলো আকাশ কাঁপানো সাড়া। তারপর আর খেলা জমে নি! রেল দল যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলে। প্রতিযোগিতামূলক খেলা উত্তরপর্বে একপেশে অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। তখন যা কিছু খেলেছে ইস্টবেঙ্গলই। খেলা খেলা ভাবের আবেগে ছেলেখেলাও করেছে। আর অনিবার্য পরাজয়কে মেনে নিয়ে ইস্টার্ণ রেলও যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষান্তি দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছে।

একা সঞ্জীব বসু আর কতোদিক সামলাবেন? যতোক্ষণ পেরেছেন একাই ব্যূহরক্ষা করেছেন। সেদিন রক্ষণভাগের সেরা খেলোয়াড়ের আসনটি সঞ্জীবের দিকে বাড়িয়ে দিতে কারুরই আপত্তি হয় নি। কিন্তু একজন স্টপার মানে একটি পুরো দল নয়। তাই আর দশজনের ত্রুটিতে রেলের চাকায় সেদিন শেষপর্যন্ত মরচে ধরেই রইলো।

অথচ গড়গড়িয়ে চলার কতো না প্রতিশ্রুতিই ছিল। ইস্টার্ণ রেল ছকবাঁধা খেলায় অভ্যস্ত। দলগত সংহতির মূল্য তাঁরা বোঝেন। প্রদীপ ব্যানার্জি, কাজল মুখার্জির মতো খেলোয়াড়ও সেই দলে আছেন! কিন্তু সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা এই যে প্রদীপের চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। আর প্রদীপ শিখাটিও যেন মিন্‌মিনে।

ভাল খেলার হদিশ জাগিয়ে রেল দল ভালভাবেই শুরু করেছিল। প্রথমার্ধে তারাই প্রবলতর পক্ষ। এক গোলে অগ্রগামী। মীরকাশেমের আড়াআড়ি সেণ্টারে সময়মতো মাথা দিতে পারলেই এন গাঙ্গুলী রেল দলকে আর এক ধাপ আগে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন। বল দিয়ে নিয়ে তাঁরা খেলছেন। সমজে বুঝে পথ হাঁটছেন। তখন সত্যিই রেলের চাকা ঢালু পথে নির্বিঘ্নে

গড়াচ্ছে! তখন ইস্টবেঙ্গলের সামনে অনেক সমস্যা। শর্মা-সতীশ-অসীম-পরিমল, কেউই সমঝোতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াতে পারছেন না। একেবারে খাপছাড়া অবস্থা। ইস্টবেঙ্গল তখন যেন ভাঙা দল, গোঁজামিলে জোড়াতালি দেওয়া এক ভঙ্গুর কাঠামো।

কিন্তু বিরতির পরই অবস্থা গেল বদলে। সমাজপতি অবসর নিলেন। দলের সমস্যা বাড়ার কথা। কিন্তু রক্ষণভাগের সুনীল ভট্টাচার্যকে সামনে রাখা সত্ত্বেও দলের সঙ্গতি বাড়লো। সমস্যার হলো অবসান। যেন তাঁবুর মধ্যে লুকানো ছিল বর্ধিত মনোবলের পুঁজি। বিশ্রামের পর শুধু সেইটুকু নিয়েই ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা মাঠে ফিরে এলেন। আর সেই মূলধনেই আগের পরাজয়ের শোধ নিলেন একে একে দু দুটি গোল করে। গুরকৃপাল, নঈম ছিলেন না। সমাজপতি অনুপস্থিত। তবু বাড়তি মনোবলে উজ্জীবিত হতে পেরেছে ইস্টবেঙ্গল। তারা জিতেছে মূলতঃ এই প্রেরণাতেই। উঁচু দরের খেলা খেলছে, একথা বলা যায় না। বলতে হয় যে জেতার সঙ্কল্পে জান্ মান কবুল করতে দলের এগারোজনে একজোট হয়েছেন বিশ্রামান্তে।

এই সঙ্কল্প ও উজ্জীবনই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পরম পাথেয়। এমন সঙ্কল্প রেল দলের ছিল না। জিততে হবেই এই মন্ত্রে ইস্টার্ণ রেলের দীক্ষা কোনোদিনই সম্পূর্ণ হয় নি বলে আমার বিশ্বাস। যতোই খেলুক না কেন, জেতার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হতে শেখে নি। সে শিক্ষা ইস্টবেঙ্গলের আছে। তাই ইস্টবেঙ্গল সেদিন নানান প্রতিবন্ধকতার বাধা ডিঙিয়ে খেলার মোড় ঘোরাতে পেরেছিল।

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে শুধু প্রথা প্রকরণই সব নয়। মানসিক উজ্জীবনও সাফল্যের এক চাবিকাঠি। পরিভাষায় যাকে বলে 'Killer instinct', সেটুকু থাকা চাই। সেই সঙ্গতি দিয়ে অনেক

ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়া যায়। অনেক সমস্যার সমাধানও করা চলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সেদিনের খেলার দ্বিতীয়পর্বে ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা।

তার মানে এ নয় যে সেদিনের আসরে ক্রীড়া প্রথা প্রকরণের নিরিখে ইস্টবেঙ্গল সত্যিই ভাল খেলেছে। দ্বিতীয়ার্ধে মনোবলের পরিচয় রেখেছে। মেহনতেও ফাঁকি দেয় নি। কিন্তু ভাল খেলা বলতে যা বোঝায়, নিয়ন্ত্রিত, নিখাঁজ আক্রমণ গড়ার সাফল্যেই যার অন্তর্নিহিত অর্থ জড়ানো, সেই খেলা কি ইস্টবেঙ্গল দেখাতে পেরেছে? দল হিসেবে অবশ্যই ইস্টার্ণ রেলের চেয়ে উপযুক্ত ছিল। তার বেশি আর কিছুই বলা চলে না।

সত্যি ভাল খেলতে পারলে একটি ফ্রিকিকে জয়ের মূলধন সংগ্রহের জন্যে ইস্টবেঙ্গলকে প্রতীক্ষা করতে হোতো না। ফরোয়ার্ডদের গঠনমূলক চেষ্টার সূত্রেই জয়লক্ষ্মী এগিয়ে আসতেন। কিন্তু সে পথে বিজয়লক্ষ্মী দলের অনুকূলে আসেন নি। এসেছেন ব্যক্তি বিশেষের অসামান্য নিপুণতার সূত্র ধরে। দ্বিতীয়ার্ধের পরিমল ছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনের আর কেই বা ভাল খেলেছেন?

অনুপাতে রক্ষণকাজে রামবাহাদুর, শান্ত মিত্র এবং প্রথমার্ধে চন্দন ব্যানার্জির ভূমিকা ছিল অনেক উজ্জ্বল। চন্দন প্রথমার্ধে নঈমের অনুপস্থিতি বুঝতে দেন নি। রামবাহাদুর অক্লান্ত পরিশ্রমের জ্বলন্ত প্রতীক। আর শান্ত শুধু জীবন্ত বুদ্ধির পরিচয়েই এক আশ্বাস জাগানো ছবি।

দু দলের গোলরক্ষক বিশ্বস্ত থঙ্গরাজ অথবা উঠতি রতন ঘোষ, দুজনের কেউই নিজের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। গড়ানে মিনমিনে সট থঙ্গরাজের নাগাল গলে গোলে ঢোকার সময় মনে হয়েছে যে এই দীর্ঘকায় খেলোয়াড়টি উর্ধ্বাকাশে যতোটা প্রস্তুত মাটিতে বুঝি তেমনিই অপ্রস্তুত। তাঁর বেসামাল অবস্থার আরও কারণ খেলার গতিবিধি আন্দাজে দীর্ঘসূত্রতা।

আগে বুঝতে পারলে থঙ্গরাজ আরও আগে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে অনায়াসে গড়ানে বলটিকে আঁকড়ে ধরতে পারতেন। কিন্তু পারলেন কই? বোঝার ভুলে তিনি সহজ কাজটি সাধ্যায়ত্ব করতে পারেন নি। যেমন পারেন নি অবিকল একই কারণে রতন ঘোষ একটি গোলের পথ রুখতে। দূর থেকে ধনুকের মতো বাঁকানো পথে বল এসে যদি কোনো গোলরক্ষকের মাথা টপকে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে গলদ কোথায়। গলদ ছিল রতন ঘোষের মানসিক প্রস্তুতিতে এবং শেষ সময়ে তাঁর শারীরিক মূলধনেও টান পড়েছিল।

থঙ্গরাজ সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা। তিনি নিজের সামর্থে অধুনা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভরসা রাখতে চাইছেন। আত্মপ্রত্যয় প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই মূলধন। কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা হলে পরের সামর্থকে কি যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়? হয় না। থঙ্গরাজও যেন আজ নিজের কর্মকেই বেশি করে চিনছেন, অন্যদের উপেক্ষা করে। তারই ফলে অকারণে বেশিক্ষণ হাতে বল রাখছেন। আগুয়ান ফরোয়ার্ডদের নাকের ডগায় বল বাড়িয়ে. পরক্ষণেই আবার তা টেনে নিয়ে লোক দেখানো তরকিবে আত্মস্থ হয়ে উঠছেন।

এ কাজে সস্তা হাততালি তিনি পাচ্ছেন বটে কিন্তু পদস্খলন ঘটে গেলে যে মাশুল গুনতে হবে তার ভার কি দলের ঘাড়ে ভূতের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না? আর এই হাততালির মূল্যই বা কতোটুকু? যার হাত নেই শুধু পা দুখানাই সম্বল, নিজের দু পা ও দু হাত দিয়ে তাকে নাকাল করায় সত্যিকারের বাহাদুরী কিছুই নেই। যুদ্ধ যেখানে সমানে সমানে নয়, সেখানে অন্যপক্ষকে টেক্কা দিতে অনেকেই পারে। যা অনেকে পারে তাই পারাতে ভারতশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক থঙ্গরাজের এতো আগ্রহ কেন?

নজীরটি সুস্থ নয়। শোভন তো নয়ই।

কিন্তু ওকথা থাক। মোদ্দা কথা এই যে বিশ্রামের পর· মানসিক উজ্জীবন এবং পরিমল দের ফ্রি কিকের কল্যাণে ওই খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছে।

ইস্টবেঙ্গল জিতেছে! ঘোষণাটি শোনার যদি ফুরসৎ হোতো জীবনহরি শর্মার!

জয় তালিকা : আই এফ এ শীল্ড

	বিজয়ী	রানার্স
১৮৯৩	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	ডব্লিউ ডি আর এ
১৮৯৪	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	রাইফেল ব্রিগেড
১৮৯৫	রয়াল ওয়েলস ফুসিলিয়ার্স	স্রপশায়ার এল আই
১৮৯৬	ক্যালকাটা	স্রপশায়ার এল আই
১৮৯৭	ড্যালহৌসী	৪১তম ফিল্ড ব্রিগেড
১৮৯৮	গ্লস্টার্স রেজিঃ	৪২তম হাইল্যাণ্ডারস
১৮৯৯	সাউথ ল্যাঙ্কাশায়র	ব্যারাকপুর আর্টিলারি
১৯০০	ক্যালকাটা	ড্যালহৌসী
১৯০১	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯০২	৯৩ তম হাইল্যাণ্ডারস	ড্যালহৌসী
১৯০৩	ক্যালকাটা	কে ও এস বি
১৯০৪	ক্যালকাটা	কে ও আর আর
১৯০৫	ড্যালহৌসী	ক্যালকাটা
১৯০৬	ক্যালকাটা	এইচ এল আই
১৯০৭	এইচ এল আই	ক্যালকাটা
১৯০৮	গর্ডন হাইল্যাণ্ডারস	ক্যালঃ কাস্টমস
১৯০৯	গর্ডন হাইল্যাণ্ডারস	ক্যালঃ কাস্টমস
১৯১০	গর্ডন হাইল্যাণ্ডারস	ক্যালকাটা
১৯১১	মোহনবাগান	ইষ্ট ইয়র্ক
১৯১২	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৩	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	৯১তম হাইল্যাণ্ডারস
১৯১৪	কে ও আর	ক্যালকাটা
১৯১৫	ক্যালকাটা	ক্যালঃ কাস্টমস
১৯১৬	নর্থ স্ট্যাফোর্ড	ক্যালকাটা
১৯১৭	১০ম মিডলসেকস	ব্রেকনশায়ার রেজিঃ
১৯১৮	ট্রেনিং রিজার্ভ ব্যাটেঃ	সিগন্যাল সার্ভিস

	বিজয়ী	রাণার্স
১৯১৯	১ম বিঃ ব্রেকনশায়ার	ক্যালকাটা
১৯২০	ব্ল্যাক ওয়াচ	কুমারটুলি
১৯২১	৩য় ব্রেকনশায়ার	রয়াল ওয়েষ্ট কেণ্ট
১৯২২	ক্যালকাটা	ড্যালহৌসী
১৯২৩	ক্যালকাটা	মোহনবাগান
১৯২৪	ক্যালকাটা	২৩তম ব্রিগেড আর
১৯২৫	২য় আর এস এফ	চেশায়ার রেজিঃ
১৯২৬	শেরউড ফরেস্টার্স	ক্যামেরণ হাইল্যাণ্ডারস
১৯২৭	শেরউড ফরেস্টার্স	ক্যালকাটা
১৯২৮	শেরউড ফরেস্টার্স	ড্যালহৌসী
১৯২৯	২য় আর এস এফ	রেঙ্গুন কাস্টমস
১৯৩০	সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডারস	রয়াল রেজিঃ
১৯৩১	এইচ এল আই	ডারহাম এল আই
১৯৩২	দ্বিতীয় এসেকস রেজিঃ	সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯৩৩	ডি সি এল আই	কে আর আর
১৯৩৪	খেলা পরিত্যক্ত (ডারহাম—কে আর আর)	খেলা পরিত্যক্ত
১৯৩৫	ইষ্ট ইয়র্ক রেজিঃ	লয়াল রেজিঃ
১৯৩৬	মহামেডান স্পোর্টিং	ক্যালকাটা
১৯৩৭	ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড	পুলিশ এ সি
১৯৩৮	ইষ্ট ইয়র্ক রেজিঃ	মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯	পুলিশ এ সি	ক্যালঃ কাস্টমস
১৯৪০	এরিয়ান ক্লাব	মোহনবাগান
১৯৪১	মহামেডান স্পোর্টিং	কে ও এস বি
১৯৪২	মহামেডান স্পোর্টিং	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৪৩	ইষ্টবেঙ্গল	পুলিশ এ সি
১৯৪৪	বি এ রেলওয়ে	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৪৫	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান

	বিজয়ী	রাণার্স
১৯৪৬	খেলা হয়নি	খেলা হয়নি
১৯৪৭	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৪৮	মোহনবাগান	ভবানীপুর
১৯৪৯	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৫০	ইষ্টবেঙ্গল	সার্ভিসেস
১৯৫১	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৫২	খেলা পরিত্যক্ত (মোহনবাগান—রাজস্থান)	খেলা পরিত্যক্ত
১৯৫৩	ইণ্ডিয়া কালচার লীগ	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫৪	মোহনবাগান	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	রাজস্থান	এরিয়ান ক্লাব
১৯৫৬	মোহনবাগান	এরিয়ান ক্লাব
১৯৫৭	মহামেডান স্পোর্টিং	রেলওয়ে স্পোর্টস
১৯৫৮	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৫৯	খেলা পরিত্যক্ত	খেলা পরিত্যক্ত

ডুরাণ্ড

১৮৮৮ রয়াল স্কট ফুসিঃ
১৮৮৯ এইচ এল আই
১৮৯০ এইচ এল আই
১৮৯১ স্কটিশ বর্ডার্স
১৮৯২ স্কটিশ বর্ডার্স
১৮৯৩ এইচ এল আই
১৮৯৪ এইচ এল আই
১৮৯৫ এইচ এল আই
১৮৯৬ সমারসেট এল আই
১৮৯৭ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৮৯৮ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৮৯৯ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯০০ এস ডব্লিউ বর্ডার্স
১৯০১ এস ডব্লিউ বর্ডার্স
১৯০২ হ্যাম্পশায়ার রেজিঃ
১৯০৩ রয়াল আইরিশ রাইফেলস
১৯০৪ নর্থ স্ট্যাফোর্ডশয়ার
১৯০৫ রয়াল ড্রাগনস
১৯০৬ ক্যামেরোনিয়াস
১৯০৭ ক্যামেরোনিয়াস
১৯০৮ ল্যাঙ্কাশায়ার ফুসিলিয়ার্স
১৯০৯ ল্যাঙ্কাশায়ার ফুসিলিয়ার্স
১৯১০ রয়াল স্কট ফুসিলিয়ার্স
১৯১১ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১২ রয়াল স্কট ফুসিলিয়ার্স
১৯১৩ ল্যাঙ্কাশায়ার ফুসিলিয়ার্স
১৯১৪—১৯ খেলা হয়নি
১৯২০ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯২১ তৃতীয় উষ্টার্স
১৯২২ ল্যাঙ্কাশায়ার ফুসিলিয়ার্স
১৯২৩ চেশায়ার রেজিঃ
১৯২৪ প্রথম উষ্টার্স
১৯২৫ শেরউড ফরেষ্টার
১৯২৬ ডারহাম লাইট ইনঃ
১৯২৭ ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাশায়ার
১৯২৮ শেরউড ফরেষ্টার
১৯২৯-৩০ ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাশায়ার
১৯৩১ ডেভনশায়ার
১৯৩২-৩৩ কিংস স্রপশায়ার
১৯৩৪ বি কোর সিগন্যালস
১৯৩৫ বর্ডার রেজিঃ
১৯৩৬ এ ও এস হাইল্যাণ্ডারস
১৯৩৭ বর্ডার রেজিঃ
১৯৩৮-৩৯ এস ডব্লিউ বর্ডাস
১৯৪০ মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪১-৪৯ খেলা হয়নি
১৯৫০ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১-৫২ ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫৩ মোহনবাগান
১৯৫৪ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫ মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৬ ইষ্টবেঙ্গল

১৯৫৭ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৮ মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৯ মোহনবাগান
১৯৬০ মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল
(যুগ্মবিজয়ী)

রোভার্স

১৮৯১ প্রথম উষ্টার্স রেজিঃ
১৮৯২ প্রথম উষ্টার্স রেজিঃ
১৮৯৩ দ্বিতীয় ল্যাঙ্কস ফুসিলিয়ার্স
১৮৯৪ দ্বিতীয় রয়াল স্কট ফুসিঃ
১৮৯৫ দ্বিতীয় রয়াল স্কট ফুসিঃ
১৮৯৬ দ্বিতীয় ডারহাম এল আই
১৮৯৭ দ্বিতীয় মিডলসেকস রেজিঃ
১৮৯৮ এইচ এল আই
১৮৯৯ দ্বিতীয় রয়াল আইরিশ রেজিঃ
১৯০০ ৪২তম রয়াল হাইল্যাণ্ড
১৯০১ রয়াল আইরিশ রেজিঃ
১৯০২-৪ প্রথম চেশায়ার রেজিঃ
১৯০৫ প্রথম সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৬ দ্বিতীয় রয়াল স্কট ফুসিঃ
১৯০৭ দ্বিতীয় ইষ্ট ল্যাঙ্কাশায়ার
১৯০৮ দ্বিতীয় উষ্টার্স রেজিঃ
১৯০৯-১০ দ্বিতীয় লিষ্টার্স রেজিঃ
১৯১১ প্রথম ওয়ারউইক রেজিঃ
১৯১২ দ্বিতীয় ডরসেট রেজিঃ
১৯১৩ প্রথম রয়াল স্কট
১৯১৪-২০ খেলা হয়নি
১৯২১ দ্বিতীয় কে এস এল আই
১৯২২-২৩ ডারহাম
১৯২৪-২৬ মিডলসেক্স রেজিঃ
১৯২৭ চেশায়ার রেজিঃ
১৯২৮-২৯ ওয়ারউইক রেজিঃ
১৯৩০ কে ও এস বি
১৯৩১ রয়াল ওয়েষ্ট কেণ্ট
১৯৩২ রয়াল আইরিশ ফুসিঃ
১৯৩৩ কিংস ওন রেজিঃ
১৯৩৪ শেরউড ফরেষ্টার্স
১৯৩৫ কিংস ওন রেজিঃ
১৯৩৬ কিংস ওন রেজিঃ
১৯৩৭ বাঙ্গালোর মুসলিম
১৯৩৮ বাঙ্গালোর মুসলিম
১৯৩৯ ফিল্ড রেজিঃ
১৯৪০ মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪১ ওয়েলস রেজিঃ
১৯৪২ বাটা স্পোর্টস ক্লাব
১৯৪৩ রয়াল এয়ার ফোর্স

১৯৪৪ বৃটিশ বেস আর ক্যাম্প
১৯৪৫ মিলিটারী পুলিশ
১৯৪৬ বৃটিশ বেস আর ক্যাম্প
১৯৪৭ খেলা পরিত্যক্ত
১৯৪৮ বাঙ্গালোর মুসলিম
১৯৪৯ ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫০ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১-৫২ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৩ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৪ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫ মোহনবাগান
১৯৫৬ মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৭ হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৯ মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০ অন্ধ্র পুলিশ

———

কলকাতা ফুটবল লীগ : সিনিয়ার ডিভিসন

	বিজয়ী	রাণার্স
১৮৯৮	গ্লস্টার্স	রেঞ্জার্স
১৮৯৯	ক্যালকাটা	কে আর আর
১৯০০	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	ক্যালকাটা
১৯০১	রয়াল আইরিশ রাইফেলস	ক্যালকাটা
১৯০২	কে ও এস বর্ডারস	৯৩তম হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৩	৯৩তম হাইল্যাণ্ডার্স	ক্যালকাটা
১৯০৪	কে ও আর	ক্যালকাটা
১৯০৫	কে ও আর	ক্যালকাটা
১৯০৬	এইচ এল আই	ক্যালকাটা
১৯০৭	ক্যালকাটা	এইচ এল আই
১৯০৮	গর্ডন এল আই	এইচ এল আই
১৯০৯	গর্ডন এল আই	ড্যালহৌসী
১৯১০	ড্যালহৌসী	কাস্টমস
১৯১১	৭০তম কোং আর জি এ	ক্যালকাটা
১৯১২	ব্ল্যাক ওয়াচ	প্রথম মিডলসেকস রেজি:
১৯১৩	ব্ল্যাক ওয়াচ	৯১তম মিডলসেকস রেজি:
১৯১৪	৯১তম হাইল্যাণ্ডার্স	রয়াল ফুসিলিয়ার্স
১৯১৫	১০ম মিডলসেকস	ই বি এন আর
১৯১৬	ক্যালকাটা	মোহনবাগান
১৯১৭	লিনকন রেজি:	ক্যালকাটা
১৯১৮	ক্যালকাটা	লিনকন রেজি:
১৯১৯	দ্বাদশ স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটে:	সমারসেট রেজি:
১৯২০	ক্যালকাটা	মোহনবাগান
১৯২১	ড্যালহৌসী	মোহনবাগান
১৯২২	ক্যালকাটা	প্রথম আর ডব্লিউ কেন্ট
১৯২৩	ক্যালকাটা	ড্যালহৌসী
১৯২৪	ক্যামেরোনিয়ান্স	এস ডব্লিউ বর্ডারস/ড্যালহৌসী
১৯২৫	ক্যালকাটা	মোহনবাগান
১৯২৬	নর্থ স্ট্যাফোর্ডস	ক্যালকাটা
১৯২৭	নর্থ স্ট্যাফোর্ডস	ড্যালহৌসী
১৯২৮	ড্যালহৌসী	ডি সি এল আই
১৯২৯	ড্যালহৌসী	ডি সি এল আই/মোহনবাগান
১৯৩০	খেলা অসম্পূর্ণ	——
১৯৩১	ডারহামস এল আই	ক্যালকাটা
১৯৩২	ডারহামস এল আই	ইষ্টবেঙ্গল

	বিজয়ী	রাণার্স
১৯৩৩	ডারহামস এল আই	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৩৪	মহামেডান স্পোর্টিং	ড্যালহৌসী/মোহনবাগান
১৯৩৫	মহামেডান স্পোর্টিং	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৩৬	মহামেডান স্পোর্টিং	ব্লাক ওয়াচ
১৯৩৭	মহামেডান স্পোর্টিং	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৩৮	মহামেডান স্পোর্টিং	কাস্টমস
১৯৩৯	মোহনবাগান	রেঞ্জার্স
১৯৪০	মহামেডান স্পোর্টিং	মোহনবাগান
১৯৪১	মহামেডান স্পোর্টিং	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৪২	ইষ্টবেঙ্গল	মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৪৪	মোহনবাগান	মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৫	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৪৬	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৪৭	খেলা পরিত্যক্ত	——
১৯৪৮	মহামেডান স্পোর্টিং	মোহনবাগান
১৯৪৯	ইষ্টবেঙ্গল	মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫০	ইষ্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৫১	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫২	ইষ্টবেঙ্গল	ভবানীপুর
১৯৫৩	খেলা অসম্পূর্ণ	——
১৯৫৪	মোহনবাগান	উয়াড়ী
১৯৫৫	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল/এরিয়ান্স
১৯৫৬	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫৭	মহামেডান স্পোর্টিং	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৫৮	ইষ্টার্ণ রেলওয়ে	মোহনবাগান
১৯৫৯	মোহনবাগান	ইষ্টবেঙ্গল
১৯৬০	মোহনবাগান	মহামেডান স্পোর্টিং

———